Abdullah Al-Muti
Bigganer Bishmoy (Wonderworld of Science)
First publication : 1986, December

Represent: banglainternet.com

বিজ্ঞানের উষাকালে

মানুষ তার সভ্যতার আজকের স্তরে পৌঁছেছে বহু লক্ষ বছর ধরে জীবনের নদী সাঁতরে—বিপুল অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে শিক্ষার ঐশ্বর্য আহরণ করে।

এই ঐশ্বর্যের মধ্যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে মানুষের আয়ত্ত বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি। বিজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটেছিল মূলত প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের আকুতি থেকে। প্রযুক্তির উদ্ভব জীবনকে সহজ আর স্বচ্ছন্দ করার প্রয়োজনে। এক পর্যায়ে এই দুইয়ের ঘটেছে মণিকাঞ্চন-যোগ। প্রকৃতির নানা গভীর রহস্য উদ্ঘাটন করে তার নিয়মাবলি মানুষ কাজে লাগাতে শুরু করেছে তার জীবনকে আরো আনন্দময়, আরো তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার জন্য। সে প্রক্রিয়া আজো চলেছে—বলা চলে ক্রমেই মানুষের জীবনে বিজ্ঞানের ভিত আরো দৃঢ়মূল হয়ে উঠছে।

বিজ্ঞানের অবস্থান আজ যত দৃঢ়ই হোক, মানুষের জীবনে তার এ প্রতিষ্ঠা একদিনে অকস্মাৎ ঘটে নি। দীর্ঘকাল ধরে নিরবচ্ছিন্ন কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষ বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করেছে। তার জন্য তাকে অনেক প্রাচীন সংস্কার আর বিশ্বাসকে ছাড়তে হয়েছে, আয়ত্ত করতে হয়েছে নতুন প্রশ্নশীলতাকে, পরীক্ষা থেকে সত্য আহরণের পদ্ধতিকে। বহু মানুষের মনীষা, সাধনা আর ত্যাগ রয়েছে এই নতুন পদ্ধতির পেছনে। বিজ্ঞানের উষাকালের একটি কাহিনী থেকে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

একজন আদি বিজ্ঞানী

সময়টা খ্রীষ্টপূর্ব ৪১০ সালের কাছাকাছি। গ্রীক সভ্যতা মধ্যাহ্ন অতিক্রম করেছে; কিন্তু তখনও তার দীপ্তি ভাস্বর। সক্রেটিস বার্ধক্যে পা দিয়েছেন। প্লেটোর কেবল কৈশোর।

banglainternet.com

দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শহর তখন এথেন্স। এই শহরের নাগরিক ফিলিস্কাস। জ্বরে শয্যাগত। রোগীর ঘরে স্ত্রী। বাইরে আত্মীয়-পরিজন সংবাদের অপেক্ষায়।

সংবাদ ভাল নয়। ফিলিস্কাস নিজের স্ত্রীকে চিনতে পারছে না। ঘুম হয় নি। প্রস্রাব হয়েছে কাল রঙের।

আত্মীয় পরিজনের মধ্যে ছিলেন ফিলিস্কাসের শ্বশুর। শুনে বললেন: "লক্ষণটা সুবিধের ঠেকছে না। মনে হয় নরকের দেবী হেকাতি'র চররা ওকে কুরে কুরে খাচ্ছে।"

আর একজন বয়স্ক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন: "একে দেখেছে কে?"

জবাব পাওয়া গেল: "দু'দিন আগে এসেছিল মিসরীয় হেকিম ইম-রাম, কিন্তু তার ওষুধে কোন কাজ হয়নি।"

অ্যাপলোর সন্তুষ্টি বিধান না করে মিসরীয় বৈদ্য ডাকার কথা শুনে বৃদ্ধ প্রসন্ন হলেন না, সেটা তাঁর ভ্রূভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল।

ফিলিস্কাসের ছেলে মা-কে মনে করিয়ে দিল: "আর ব্যাবিলনের সেই লোকটি যে এসেছিল—যে ছাগল উৎসর্গ করে তার কলজে দিয়ে ভাগ্য গণনা করেছিল। কলজেটা বিছিয়ে দেখিয়েছিল সে আমাদের। তার ডান দিকের অংশ আর বাঁ দিকের অংশ সমান নয়। আর পিত্ত-কোষের মধ্যে ছিল অনেকগুলো পাথর।"

"পাথর? কটা?"—বৃদ্ধ জানতে চাইলেন।

"তিনটে বড় আর অনেকগুলো ছোট ছোট।"

"তিনটে? তাহলে তো ব্যাপারটা সাংঘাতিক।" বৃদ্ধ মাথা নাড়তে লাগলেন। "চারটে থাকার কথা। একটা উপাদানের অভাব ঘটেছে।"

এবার রোগীর স্ত্রী মুখ খুলল: "জ্ঞান হলেই শুধু পানি খেতে চায়।"

"হ্যাঁ"—বৃদ্ধটির স্বর এবার গুরুগম্ভীর শোনাল: "অগ্নি, বায়ু, মাটি, পানি—পিথাগোরাসের এই চারটি উপাদান। এর একটি যদি হেকাতি দেবীর চররা অথবা আর কোন অপদেবতা নিয়ে যায় তাহলে পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। দেখা যাচ্ছে রোগীর শরীরে অগ্নির আধিক্য। তাকে এর বিপরীত অর্থাৎ পানিই দেওয়া প্রয়োজন।"—নিজের যুক্তির যথার্থতায় তাঁকে খুব প্রসন্ন মনে হয়।

"কিন্তু আমি তো ওকে সকাল-সন্ধ্যা-রাত্রি বারবার শুধু পানিই দিচ্ছি—তবু তো কোন উপকার দেখছি না।" স্ত্রী জবাব দেয়।

শ্বশুর এবার বললেন: "একে যদি দেবতা এস্‌কিলাপিয়াসের মন্দিরে নিয়ে সেখানকার পুরোহিতদের হাতে সঁপে দেয়া যেত তাহলে চিকিৎসার আর কোন ভাবনা ছিল না।"

স্ত্রী মাথা নাড়ে: "কিন্তু যা শক্ত অসুখ, রোগীর একেবারে হুঁশ নেই। ওকে কি নড়ানো ঠিক হবে?"

"ছোটবেলায় আমি একবার মন্দিরে গিয়েছিলাম, আমার এই চোখের চিকিৎসার জন্য।"—বৃদ্ধ তাঁর স্মৃতির সমুদ্র মন্থন করে যেন আপন মনে বলতে লাগলেন:

"আমার চোখে ছিল অসহ্য যন্ত্রণা। আর অনবরত পানি ঝরছিল। মন্দিরে গিয়ে সব ভাল হয়ে গেল। পুরোহিতরা প্রথমে আমাকে স্নান করালেন লোনা পানিতে। তারপর আবার স্নান করতে হল পরিষ্কার পানিতে। স্নানের পর আমার আত্মাকে শুদ্ধ করার জন্য উপাসনা করা হল। দিতে হল উৎসর্গ। তারপর চার দিন উপোস থেকে ঢুকতে হল মন্দিরের মধ্যে। সেখানে রয়েছে দেবতা এস্‌কিলাপিয়াসের মূর্তি। সে কী বিশাল মূর্তি! গজদন্তে তৈরি দেহ, বাকিটা সোনায় মোড়া, তার ওপর নানা রঙের গিল্টি করা।

"মন্দিরের মেঝেতে পড়ে ছিল আমার মতো আরো অনেক রোগী। রাত্রে ঘুমের ঘোরে মনে হল দেবতা তাঁর বেদী থেকে নিচে নেমে এসেছেন। আর হেঁটে বেড়াচ্ছেন আমাদের মাঝে। তাঁর সঙ্গে রয়েছে দু'টি বিরাট হলুদ রঙের সাপ আর একটি কুকুর। দেবতা এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। একটি সাপ আমার চোখ চাটতে লাগল। তারপর দেবতা যেন চোখে কী মলম লাগিয়ে দিলেন। সকালে উঠে দেখি আমার পাশে রয়েছে একটি দেবদত্ত ওষুধের কৌটা। আশ্চর্য। সেই ওষুধ লাগিয়ে ক'দিনের মধ্যে আমার চোখ ভাল হয়ে গেল।"

তরুণের মুখে ফুটে ওঠে অবিশ্বাসের হাসি। সেদিকে চোখ পড়ায় বৃদ্ধ উত্তেজিত হয়ে উঠল: "আজকালকার ছোকরাগুলো পুরনো দিনের এসব জিনিস আর বিশ্বাস করে না। কিন্তু জেনে রাখো, মন্দিরের এসব অর্ঘ্য বড় মোক্ষম, বড় উপকারী। আজকালকার ওষুধ এর কাছে লাগে না।—"

হঠাৎ রোগীর আর্ত গোঙানীর আওয়াজে এই আলোচনায় বাধা পড়ল। স্ত্রী ছুটে গেল ঘরে রোগীর পাশে। ছেলেটি বৃদ্ধের পায়ের

কাছে ঘেঁষে এসে বলল : "আচ্ছা নানা, হিপোক্র্যাটিসকে ডেকে এনে দেখালে কেমন হত ? তিনি এখন এথেন্সে রয়েছেন।"

"হিপোক্র্যাটিস ? হ্যাঁ, তাঁর চিকিৎসার কথা আমি শুনেছি। তাঁর নামও আছে বেশ।"—নানা জবাব দেন, "তাঁর বাবা ছিলেন এক পুরোহিত; এস্‌কিলাপিয়াসের মন্দিরের পুরোহিত।।"

ফিলিস্কাসের স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে এল গম্ভীর মুখে। রোগীর অবস্থা খারাপ। তার বাবা জিজ্ঞেস করলেন : "হিপোক্র্যাটিসকে দেখাবে ? সেই যে ক্ল্যাজোমেনিয়ানের অসুখ সারিয়েছিল ? ক্ল্যাজোমেনিয়ানেরও ছিল এমনি জ্বর আর ব্যথা, আর এমনি প্রলাপও বকছিল। হিপোক্র্যাটিস রোজ এসে তাকে দেখত আর রোগীর অবস্থা লিখে নিত।"

"খুব সম্ভব সে বাড়ি ফিরে গিয়ে কোন দেবতার পুজো-আর্চা করত" বললেন বৃদ্ধ।

স্ত্রী আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারে না। চিৎকার করে ওঠে : "তাহলে তাকে ডেকে পাঠাও, এখুনি তাকে নিয়ে এসো।" সঙ্গে সঙ্গে দরজা ডিঙিয়ে ছেলেটি ছুটল হিপোক্র্যাটিসকে খবর দিতে।

হিপোক্র্যাটিস এলেন খানিকক্ষণের মধ্যেই। পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে বয়স, লম্বা, সৌম্য দেহকান্তি। সঙ্গে তাঁর তিন শিষ্য। তার মধ্যে দু'জন তার ছেলে থেসালাস আর ড্রাকন, আরেকজনের নাম দেসিস্পাস।

ধীরে ধীরে রোগীর পাশে গিয়ে তিনি তার কপালে হাত রাখলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার শরীরে কি কোথাও ব্যথা আছে ?"

ফিলিস্কাস শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। প্রলাপে ঠোঁট একটু কেঁপে উঠল, তারপর হঠাৎ উঠে বসার চেষ্টা করতে লাগল। হিপোক্র্যাটিসের শিষ্যরা তাকে ধরে থামাল।

হিপোক্র্যাটিস জিজ্ঞেস করলেন : "কখন থেকে প্রলাপ শুরু হয়েছে ?"

স্ত্রী জবাব দেয় : "কাল বিকাল থেকে।"

"অসুখের ক'দিন হল ?"

"আজ তিন দিন। বাজারে গিয়ে রোদে দাঁড়িয়ে লোকজনের সাথে আলাপ করছিল। তার কোন কথা হয়তো দেবতাদের মনঃপূত হয় নি তাই—"

হিপোক্র্যাটিস হাত তুলে তাকে থামালেন : "দেবতাদের কথা না এনে শুধু আসল ঘটনা বললেই হবে।"

স্ত্রী তার দিকে তাকাল ভয়ে ভয়ে। "হ্যাঁ, বাড়ি এসে সে শুয়ে পড়ল। সারা গায়ে ঘাম হতে লাগল, তার সঙ্গে খুব অসোয়াস্তি। কাল দ্বিতীয় দিনে অবস্থা আরো খারাপ হল।"

"রোগী কি মলত্যাগ করেছিল ?"

"করেছিল। কাল সন্ধ্যায় খুব সামান্য পরিমাণে।"

"দেসিস্পাস কথাটা লিখে নাও। হ্যাঁ, তারপর।"

"আজ অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। গা খুব গরম। কাঁপুনি দিচ্ছে, ঘাম হচ্ছে, সর্বক্ষণ তৃষ্ণা আছে। অনবরত প্রলাপ বকছে। আর প্রস্রাব হয়েছে কাল রঙের।"

"কাল রঙের প্রস্রাব ? কোথায়, দেখি, দেখি।"—হিপোক্র্যাটিস হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

একটি ক্রীতদাস বালক মাটির পাত্রে রাখা প্রস্রাব নিয়ে এল। হিপোক্র্যাটিস তার শিষ্যদের লক্ষ্য করে বললেন : "দেখছি আবার সেই কাল প্রস্রাব। এ বছর বেশ ক'জায়গায় এমনি লক্ষণ দেখা গেল। আর সব জায়গাতেই এর ফল হয়েছে খারাপ।"

স্ত্রীকে লক্ষ্য করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : "আরো কি কিছু বলার আছে ?"

"না, আর কিছু নেই। হে মহান চিকিৎসক, এবার দেবতাদের সন্তুষ্ট করে আমার স্বামীর দেহ থেকে অপদেবতাদের তাড়াবার ব্যবস্থা করুন।"

"আপনার স্বামীর দেহে কোন অপদেবতা নেই। তার দেহে ঢুকেছে রোগ। এই রোগকে আরোগ্য করতে হবে। আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করব। দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করুন সৎ কাজ আর সৎ চিন্তার জন্য। যা তারা দিতে পারবেন না তার জন্য প্রার্থনা করে কি হবে ?"

তিনি রোগীর পথ্যের নির্দেশ দিলেন আর খেতে দিলেন চুনের পানি। একজন ক্রীতদাসকে নির্দেশ দিলেন কাপড় ভিজিয়ে রোগীর গা মুছে দিতে। আর প্রলাপের জন্য দিলেন আর একটি ওষুধ।

"আমি কাল আবার আসব রোগীকে দেখতে। আচ্ছা, দেখি দেসিস্পাস রোগীর অবস্থা তুমি সব ঠিকমতো লিখে নিয়েছ কিনা।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেনঃ "আমাদের কি কোন দেবতার কাছে উৎসর্গ করতে হবে ?"

"আমি দেবতার সাহায্যে চিকিৎসা করি না। আমি রোগীর প্রকৃতি পরীক্ষা করি, আর সে অনুযায়ী ব্যবস্থা দিই। দেবতার আশ্রয় নেবার চাইতে প্রকৃতির আশ্রয় নেয়া অনেক ভাল।"

পরদিন এসে তিনি আবার রোগীকে দেখলেন। তাঁর নির্দেশ মতো দেসিস্পাস রোগের লক্ষণ সব লিখে নিল। তার পরদিনও তেমনি। এমনি করে পঞ্চম দিনে রোগীর অবস্থা আরো খারাপের দিকে গেল। বিশেষ করে তার শ্বাস-প্রশ্বাস হয়ে উঠল কেমন অস্বাভাবিক ধরনের।

হিপোক্র্যাটিস পরিবারের সবাইকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। তারপর তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেনঃ "এর শ্বাস-প্রশ্বাসে কোন বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছ ?"

থেসালাস জবাব দিলঃ "হাঁ, মাঝে মাঝে দ্রুত, আবার কখনো অতি মন্থর। হঠাৎ থেমে থাকে। আবার মনে হয় যেন স্মৃতির সমুদ্র মন্থর করে কেঁপে কেঁপে উঠছে।"

"লিখে নাও দেসিস্পাসের। বাঃ, চমৎকার বলেছ বর্ণনাটা—যেন কেউ স্মৃতির সমুদ্র মন্থন করে কেঁপে কেঁপে উঠছে। এরকম আর কারো দেখেছিলে ?"

"থেসালোনিয়ার লোকটির যেন এমনি হয়েছিল। তারপর সেই ছোট বাড়ির বুড়িটার।"

"তারপর কি হয়েছিল ওদের ?"

"দু'জনেই মারা যায়।"

"হাঁ, তাই নিয়ম। এরকম হলে কাউকে আর বাঁচতে দেখা যায় নি। একেও সম্ভবত বাঁচাতে পারা যাবে না।"

রোগীকে পরীক্ষা করে তিনি বললেনঃ "লিখে নাও দেসিস্পাস, প্লীহা বড়। হাত পা অত্যন্ত ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা ঘাম। একদিন পর পর খিঁচুনি। কাজেই প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম—"

পরিবারের সবাইকে তিনি যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সেই রাতেই ফিলিস্কাসের মৃত্যু হল।

ইন্দ্রজাল থেকে বিজ্ঞান

বানানো গল্প নয়। ফিলিস্কাসের এই কাহিনী হেপোক্র্যাটিসের রেখে যাওয়া বর্ণনার মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাসে রোগের এত প্রাচীন আর এমন বিস্তারিত লিখিত বিবরণের কথা আর জানা যায় না। ইন্দ্রজাল থেকে বিজ্ঞানের উদ্ভবের যুগের এক আশ্চর্য কাহিনী।

প্রাচীন চিকিৎসাবিদ হিপোক্র্যাটিস দেবতাদের ধার কাছ দিয়ে যান নি। তাঁর নীতির মূল কথা ছিলঃ রোগ প্রকৃতির বিধানের অঙ্গ। কাজেই তাকে জয় করতে হলে, তাকে বুঝতে হলে অন্য যে কোন প্রাকৃতিক ঘটনার মতোই তাকে পরীক্ষা করতে হবে, বিশ্লেষণ করতে হবে।

রোগের লক্ষণ, শ্রেণীবিভাগ, চিকিৎসা পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে নানা তথ্য এর আগেও অনেকে সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু রোগ যে প্রাকৃতিক ঘটনার অঙ্গ আর প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলে একথা এমন জোর গলায় এর আগে কেউ কখনো বলেন নি। আর তাই হিপোক্র্যাটিসকে বলা হয় 'চিকিৎসাবিদ্যার জনক'।

তার আগে কত হাজার বছর কেটে গেছে তন্ত্র আর ইন্দ্রজালের সাহায্যে চিকিৎসা করতে করতে। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের শুরু থেকে হাজার পঞ্চাশ বছর হবে। কিন্তু এই সহজ তত্ত্বটি হিপোক্র্যাটিসের আগে আর কেউ এমন করে দেখেন নি। তারপর এই আড়াই হাজার বছর ধরে চিকিৎসাশাস্ত্র অগ্রসর হয়েছে তাঁরই দেখানো পথ ধরে। হিপোক্র্যাটিস বলেছেন, "চিকিৎসকের ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হল দেহের স্বাভাবিক রোগ-নিরাময় ক্ষমতা।"

ফিলিস্কাসের কাহিনী থেকে বোঝা যায় হিপোক্র্যাটিস তাঁর সময়ের চেয়ে কতখানি এগিয়ে ছিলেন। সেকালের প্রচলিত কুসংস্কার, অপদেবতাবাদ আর অন্ধবিশ্বাস সম্বন্ধে তিনি শ্লেষের সঙ্গে বলেছেন: "রাতের অন্ধকারে যা কিছু ভয়াল—জ্বর, প্রলাপ আর শয্যা থেকে লাফিয়ে ওঠা—সব কিছুকেই তারা ধরে নেয় হেকাতি দেবীর অপকীর্তি বলে।"

হিপোক্র্যাটিসের রচনা ছাড়া তাঁর জীবন সম্বন্ধে আর তেমন বেশি কিছু জানা যায় না। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তাঁর জন্ম খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬০ সালে গ্রীসের 'কস' (Cos) নামে এক ছোট দ্বীপে। তিনি বেঁচে ছিলেন নব্বই বছর। নানান জায়গায় ঘুরেছেন তিনি। প্রথম

জীবনে তিনি সম্ভবত মিসর সফর করেছিলেন, সেখানে মিসরীয় চিকিৎসা-পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। তারপর তিনি গড়ে তোলেন তাঁর নিজের চিকিৎসাপদ্ধতি। তিনি যেখানে যেখানে গিয়েছেন সেখানেই তাঁর চিকিৎসা-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। প্লেটো তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন বলে লিখেছেন, শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন তাঁর প্রতি।

হিপোক্র্যাটিসের রচনার সবচেয়ে বড় গুণ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা থেকে পাওয়া সত্যের ওপর অবিচল নির্ভরশীলতা। পর্যবেক্ষণের ফলাফল নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করা আর তা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগ্রহ। সব রকম আধিভৌতিক আর পরীক্ষার অতীত বিষয়ের ওপর গভীর অবিশ্বাস। —এ সবই আধুনিক বিজ্ঞানের সমগ্র অগ্রগতির মূল ভিত্তি।

হেপোক্র্যাটিসের রচনার মধ্য থেকে অনেকগুলি ছোট ছোট বাক্য 'হিপোক্র্যাটিসের বচন' হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছে। তার কয়েকটি নমুনা :

"জীবন সংক্ষিপ্ত, কিন্তু কলা দীর্ঘস্থায়ী।"

"একজনের জন্য যা অমৃত, অন্যের জন্য তাই বিষ।"

"যারা স্বভাবত মেদবহুল তারা ক্ষীণদেহী ব্যক্তিদের চেয়ে স্বল্পায়ু হয়ে থাকে।"

"ভোগের প্রধান সময় আঠার থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে।"

"হিজড়াদের গোদ বা টাক হয় না।"

চিকিৎসা ক্ষেত্রে হিপোক্র্যাটিসের একটি অবদান হল পথ্য নির্দেশে নিয়ম-শৃঙ্খলা। তিনি বলেছেন, পথ্য নির্দেশের সময় রোগীর বয়সের কথা মনে রাখতে হবে, কেননা "তরুণদের তুলনায় বৃদ্ধ ব্যক্তিদের পুষ্টির প্রয়োজন কম।" তারপর মনে রাখতে হবে ঋতুর কথা, কারণ "শীতকালে গ্রীষ্মের তুলনায় বেশি পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন হয়।" এরপর রোগীর স্বাস্থ্যের কথা : "ক্ষীণ ব্যক্তির খাদ্যের প্রয়োজন কম, কিন্তু তা স্নেহজাতীয় হওয়া চাই। মেদবহুল ব্যক্তির খাদ্যের প্রয়োজন বেশি, কিন্তু তাতে স্নেহবস্তু কম থাকা ভাল।"

গ্রীক পুরাকথায় আছে প্রমিথিউসের কাহিনী, যিনি মানুষের ব্যবহারের জন্য স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে এনেছিলেন মর্ত্যে। মনে হয় গল্পটি গ্রীকদের কীর্তিরই রূপক। সে যুগে মানুষের জীবন ছিল স্বর্গের দেবতাদের প্রভাব দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে জড়ানো। গ্রীকরাই প্রথম দেবতাদের সেবায় উৎসর্গিত নাটককে টেনে আনলেন মানুষের সেবায়।

তাতে স্থান পেল মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের কাহিনী। মন্দিরে দেবতার উদ্দেশে অভিনীত না হয়ে নৃত্য-গীত সহযোগে তা অভিনীত হতে লাগল মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য।

হিপোক্র্যাটিসের বেলাতেও যেন ঠিক তাই হল। রোগ নিরাময়ের 'কলা'কে তিনি ছিনিয়ে আনলেন দেবতাদের হাত থেকে। আর তাকে তুলে দিলেন মানুষের হাতে। যে রহস্যে এতদিন দেবতাদের ছিল একচেটিয়া অধিকার, এবার থেকে তা এল মানুষের আয়ত্তে।

জুলাই, ১৯৮২

ডাইনোসররা কেন ধ্বংস হল ?

একদা পৃথিবীতে চরে বেড়াত দৈত্যের মতো বিশাল সব জীবজন্তু। দারুণ দাপটে সারা দুনিয়ার ওপর রাজত্ব করেছিল তারা চোদ্দ কোটি বছরের ওপর। পৃথিবীতে এমন বিরাট প্রাণী চরতে তার আগে আর কখনো দেখা যায় নি, তারপরেও না। এই বিশালাকার ডাইনোসরদের কথা জেনেছে মানুষ কেবল উনিশ শতকের শুরুতে।

আজ আমরা জানি, একটা সময়ে পৃথিবীতে ছিল সরীসৃপ বা গিরগিটি—কিন্তু অতি বিরাট আর বেঢপ আকারের। বেশির ভাগেরই গায়ে ছিল সাপের মতো ঠান্ডা রক্ত, অর্থাৎ এদের গায়ের তাপমাত্রা চারপাশের তাপমাত্রার সাথে ওঠা-নামা করত। এরা চলত ধীরে-সুস্থে, ডিম পাড়ত ডাঙ্গায়। আর খেত ঘাস-পাতা—তবে কিছু মাংসাশী জাতও ছিল।

দুনিয়ার আবহাওয়া সে সময়ে ছিল রীতিমতো আরামের—খুব গরমও নয়, খুব ঠান্ডাও নয়। বিরাট বিরাট পাইন, ফার্ণ আর পাম জাতীয় গাছের বনে খাবার পাওয়া যেত প্রচুর। আর এমনি প্রচুর খাবার খেয়ে খেয়ে এসব প্রাণী হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিশাল আকারের। কোন কোনটা উঁচু হত আজকের চার-পাঁচ তলা দালানের সমান।

চোদ্দ কোটি বছর পৃথিবীর ইতিহাসে নেহাত কম কথা নয়। এই সময়ে দুনিয়ার নানা এলাকায় ঘটেছে বহু ওলট-পালট, গোড়ায় একটি ডাঙ্গার এলাকা ভেঙে ক্রমে ক্রমে মহাদেশগুলো আকার নিতে শুরু করেছে। কিন্তু এই দৈত্যের মতো প্রাণীরা টিকে থেকেছে এত বছর ধরে।

কিন্তু তারপর আজ থেকে মোটামুটি সাড়ে ছ' কোটি বছর আগে কী যে ঘটল, হঠাৎ দুনিয়ার বুক থেকে হারিয়ে গেল এই বিশাল প্রাণী-গুলো। এত যে তাদের নানা রকম জাত, সবই যেন হারিয়ে গেল একই

সাথে। কিন্তু কোথায় গেল তারা ? কেনই বা উধাও হয়ে গেল এই বিশাল দৈত্যেরা।

ডাইনোসরের রাজত্ব

হারিয়ে গেলেও দুনিয়ার ওপর থেকে এদের চিহ্ন একেবারে মুছে যায় নি। মাটি-পাথরের বুকে রয়ে গিয়েছে এদের হাড়-গোড়, ফসিল হয়ে যাওয়া চামড়া বা পায়ের ছাপ। এসব থেকেই বিজ্ঞানীরা জেনেছেন এদের সম্বন্ধে অনেক খবর।

এদের বিরাট বিরাট হাড়ের কিছু অংশ প্রথম মাটি খুঁড়ে পাওয়া যায় বিলেতের দক্ষিণ অংশে—১৮২২ সালে। দু'তিন দশকের মধ্যে আরো নানা জায়গায় এমনি প্রচুর হাড় পাওয়া গেল। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে বুঝলেন এগুলো বহু পুরনো কালের গিরগিটি জাতের প্রাণীর হাড়। এসব বিরাট হাড় থেকে বিজ্ঞানীরা এই প্রাণীদের নাম দিলেন ডাইনোসর; গ্রীক ভাষায় 'ডাইনো' কথাটার অর্থ ভয়ংকর আর 'সর' মানে হল গিরগিটি।

উনিশ শতক শেষ হতে হতে এ ধরনের প্রাণীদের বহু হাড় পাওয়া গেল দুনিয়ার নানা দেশে। বলতে গেলে কোন দেশই প্রায় বাদ রইল না। বোঝা গেল কেবল এক দক্ষিণ মেরু এলাকা ছাড়া এরা চরে বেড়িয়েছে সারা দুনিয়াতেই। আজ দুনিয়ার বহু দেশের জাদুঘরে স্থান পেয়েছে বিরাট বিরাট আস্ত ডাইনোসরের কঙ্কাল।

আজকাল ডাঙ্গার সবচেয়ে বড় প্রাণী আফ্রিকার হাতি উঁচু হয় বড় জোর তিন-চার মিটার; ভারি হয় পাঁচ-ছ' টন। এমনি একটা হাতির দৈনিক খোরাক দেড়শ' থেকে তিনশ' কেজি ঘাস-পাতা। অর্থাৎ প্রতি মাসে হাতি প্রায় তার নিজের ওজনের সমান পরিমাণ খাবার খায়।

১৯৩০ সালে আমেরিকায় এক অতি বিশাল ডাইনোসরের হাড় পাওয়া গেল। মাটি থেকে প্রায় তের মিটার উঁচু এর মাথা, কাজেই গাছের উঁচু মগডাল থেকে পাতা খেতেও এর অসুবিধে হত না। প্রায় আশি টন ওজন এই দৈত্যের—অর্থাৎ গোটা পনের বিশাল হাতির সমান। এর নাম দেওয়া হল ব্রাকিওসরাস (অর্থাৎ লম্বা ডানাওলা গিরগিটি—এর সামনের পা দুটো ছিল পেছনের চেয়ে বড়, তাই এই নাম)।

এত বড় দৈত্যের কত টন খাবার দরকার হত দিনে ? কেমন করে নড়াচড়া করত এটা ?—সবাই এসব ভেবে সারা। বিজ্ঞানীরা বলছেন,

পানিতে। ভেজা আবহাওয়ায় ঝর ঝর ধারায় অবিরল ঝরতে থাকে বৃষ্টি। আগে শুকনো ডাঙ্গায় যেখানে মাটিতে খনিজ উপাদান সব থেকে যেত সেখানে এখন প্রবল বৃষ্টির তোড়ে মাটি থেকে চুন জাতের উপাদান ধুয়ে যেতে লাগল। জীবজন্তুর হাড় মজবুত হবার জন্য চুন এবং অন্যান্য খনিজ উপাদান একান্ত জরুরী। ডাইনোসরদের খাবারে খনিজের অভাব ঘটায় তাদের হাড় গেল নরম হয়ে। বিশাল দেহের ওজন বইতে না পারায় তারা অক্কা পেতে লাগল। কোথাও কোথাও প্রত্নতাত্ত্বিকরা ডাইনোসরের বেঁকে যাওয়া হাড়গোড় খুঁজে পেয়েছেন।

কিন্তু একই সময়ে ছোটখাট ডাইনোসররাও মারা পড়ল কেন?—ইতিমধ্যে পৃথিবীর বুকে দেখা দিয়েছে ছুঁচোজাতীয় ছোট ছোট কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণী। সরীসৃপদের মতো স্তনাপায়ীরা ডিম পাড়ে না, আস্ত বাচ্চার জন্ম দেয়। এদের গায়ের রক্ত গরম (অর্থাৎ পরিবেশের তাপমাত্রা যাই হোক, দেহে নির্দিষ্ট উষ্ণতা বজায় রাখার ব্যবস্থা আছে), কাজের শক্তি বেশি। তারা ছুটতে পারে জোরে, বুদ্ধিতেও তারা এগিয়ে। এসব স্তন্যপায়ীরা আকারে ছোট হলেও এদের সাথে প্রতিযোগিতায় ডাইনোসররা এঁটে উঠতে পারল না।

তবে এমনি ধীরগতি বিবর্তনের ধারা দিয়ে সবটা ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায় বলে মনে হয় না। তাই বেশিরভাগ বিজ্ঞানী আজকাল মনে করেন ডাইনোসরদের ধ্বংস হবার আসল কারণ হয়তো মহাকাশের কোন আকস্মিক ঘটনা। ১৩১৪ সালে চীন দেশের জ্যোতির্বিদরা আকাশে দেখেছিলেন এক অতি উজ্জ্বল আলো—আজ যেখানে কর্কট নীহারিকা সেখানে কোন নক্ষত্র বুড়ো হয়ে মরবার আগে বিরাটভাবে উঠেছিল ফেঁপে। এ রকম ঘটনাকে বলা হয় নবতারার বিস্ফোরণ। কখনো কখনো ঘটে খুব বড় রকম অতিনবতারার বিস্ফোরণ। এমনি অতিনবতারার বিস্ফোরণে নক্ষত্রের দীপ্তি অকস্মাৎ বেড়ে উঠতে পারে কয়েক কোটি গুণ। সৌর জগতের কাছাকাছি অর্থাৎ শ'খানেক আলোক বছরের মধ্যে যদি এমনি অতিনবতারার বিস্ফোরণ ঘটে তাহলে বহু বছর ধরে পৃথিবীতে এসে পড়বে তীব্র কসমিক রশ্মি আর মারাত্মক এক্স-রশ্মি। ১৯৭৭ সালে অতিনবতারার বিস্ফোরণ সম্বন্ধে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী জোসেফ্‌শকলোভ্‌স্কি বললেন, হয়তো এমনি কিছু ঘটেছিল ডাইনোসরদের রাজত্বের শেষ দিকে। তাতে ছোটখাট আকারের

যেসব প্রাণী তারা মাটির তলায় লুকিয়ে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল, বিশাল আকারের ডাইনোসররা নিজেদের বাঁচাতে পারে নি।

হয়তো নবতারার বিস্ফোরণে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঘটেছিল এক বিরাট আলোড়ন। তাতে জলীয় বাষ্পভরা হাওয়া উঁচু আকাশে উঠে সৃষ্টি করেছিল অসংখ্য বরফের কণা। আর এমনি বরফকণার স্তর থেকে সূর্যের আলো বেশি করে ঠিকরে ফিরে যাওয়ায় পৃথিবীর তাপমাত্রা কমে যায় অনেকখানি।

ধূমকেতু আর গ্রহাণু

মার্কিন রসায়নবিদ হ্যারল্ড উরে দিলেন আরেক ব্যাখ্যা। তিনি বললেন, সম্ভবত পৃথিবীর ওপর এসে পড়েছিল বড়সড় একটি ধূমকেতু। তাতেই পৃথিবীর আবহাওয়ায় ঘটেছিল ওলট-পালট, ধুলোর আবরণে পৃথিবী ঢেকে যাবার ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা গিয়েছিল কমে—আর ডাইনোসররা সেই অতি শীতল আবহাওয়ায় টিকে থাকতে পারে নি।

আশির দশকে এ সম্পর্কে দু'টি তত্ত্ব এ ক্ষেত্রে রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। তার একটি দিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিদ ওয়ালটার আলভারেজ। উত্তর ইতালীতে ফ্লোরেন্স আর রোমের মাঝামাঝি গুব্বিও নামে একটি জায়গা আছে। আলভারেজ ১৯৭৭ সালে সেখানে একটা পাহাড়ের গায়ে পাললিক শিলার স্তর পরীক্ষা করছিলেন। এসব পাললিক শিলা সমুদ্রের তলায় স্তরে স্তরে জমা তলানী কঠিন হয়ে গিয়ে সৃষ্টি হয়। সচরাচর এসব স্তরে পাওয়া যায় নানা ধরনের সামুদ্রিক জীবের ফসিল। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল চুনাপাথরের মধ্যে এক সেন্টিমিটার চওড়া একটি লালচে কাদার স্তর—এতে কোন সামুদ্রিক জীবের হদিস পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ ঠিক তার ওপরে আর নিচের স্তরে নানা ধরনের শামুক-জাতীয় প্রাণীর ফসিল রয়েছে প্রচুর। পরীক্ষা থেকে জানা গেল এই স্তরটির বয়স মোটামুটি সাড়ে ছ'কোটি বছর—অর্থাৎ যে সময়ে ডাইনোসররা সব ধ্বংস হয়েছিল সে সময়েই সৃষ্টি এই স্তরের।

এই রহস্যজনক পাললিক স্তরের খানিকটা নমুনা ওয়ালটার পাঠিয়ে দিলেন তাঁর বাবা নোবেল পুরস্কার পাওয়া পদার্থবিদ লুই আলভারেজকে। লুই পরীক্ষা করে দেখেন এই স্তরে রয়েছে অস্বাভাবিক পরিমাণে ইরিডিয়াম। ইরিডিয়াম হল এক ধরনের অতি ভারি আর

দুষ্প্রাপ্য ধাতু—অনেকটা প্লাটিনাম আর সোনার মতো। সম্ভবত এই ভারি ধাতুটি পৃথিবীতে যেটুকু ছিল তা প্রায় সব তলিয়ে গিয়েছে গভীর ভূ স্তরে। অথচ গ্রহাণু আর উল্কাপিন্ডে এই ধাতুটি রয়েছে ভূত্বকের তুলনায় কয়েক হাজার গুণ বেশি। মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে যে উল্কা কণার বর্ষণ হয় তাতে ইরিডিয়াম ঝরে প্রচুর পরিমাণে।

গুব্বিওর পাললিক শিলায় যে পরিমাণ ইরিডিয়াম পাওয়া গেল তা অন্যান্য স্তরের তুলনায় প্রায় তিরিশ গুণ বেশি। তারপর পৃথিবীর আরো নানা জায়গায় এমনি রহস্যময় স্তরের খোঁজ পাওয়া যেতে লাগল। সব জায়গাতেই স্তরের বয়স প্রায় সাড়ে ছ'কোটি বছর; আর দেখা গেল ইরিডিয়ামের প্রাচুর্য। দু'তিন বছরের মধ্যে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে অন্তত তিরিশটি জায়গায় মিলল এমনি ভূ-স্তর।

আলভারেজদের সিদ্ধান্ত হল প্রায় সাড়ে ছ'কোটি বছর আগে মহাকাশ থেকে পৃথিবীর ওপর এসে পড়েছিল এক বিশাল গ্রহাণু বা উল্কাপিন্ড। সেটি চওড়ায় ছিল প্রায় দশ কিলোমিটার। এত বড় উল্কাপিন্ড পড়লে পৃথিবীর বুকে যে সংঘাত ঘটে তার শক্তি কয়েক লাখ বড় রকম পারমাণবিক বিস্ফোরণের সমান। এই সংঘর্ষে বিপুল পরিমাণ ধুলো ছিটকে ওঠে আকাশে। সূর্যকিরণ ঢাকা পড়ে দীর্ঘকালের জন্য। তাতে পৃথিবীর তাপমাত্রা নেমে যায়—উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষ বন্ধ হয়। মারা পড়ে ডাঙার সব গাছপালা, ধ্বংস হয় সমুদ্রের সব প্লাংকটন। গাছপালা ধ্বংস হওয়ায় উদ্ভিদভোজী ডাইনোসররা খাদ্যের অভাবে আর শীতের প্রকোপে মারা পড়তে থাকে। ফলে মাংসাশী ডাইনোসররাও মারা পড়ে।

সারা পৃথিবী জুড়ে বিশাল শীতের প্রকোপে শুধু যে ডাইনোসররাই মারা পড়েছিল তা নয়। ধ্বংস হয়েছিল প্রায় সব রকম উদ্ভিদ আর প্রাণী। শুধু অল্প কিছু ছোট আকারের স্তন্যপায়ী বেঁচে যায় এই ধ্বংসলীলা থেকে।

দশ কিলোমিটার চওড়া গ্রহাণু পৃথিবীতে এসে পড়লে প্রায় দু'শ কিলোমিটার ব্যাসের খাদ তৈরি হবার কথা; কিন্তু এত বড় একটা সংঘর্ষের চিহ্ন হিসেবে কোন খাদ পৃথিবীতে থাকল না কেন সে এক সমস্যা। কেউ কেউ বললেন, খুব সম্ভব উল্কাখন্ডটি পড়েছিল সমুদ্রে। তাই সমুদ্রতলের পরবর্তী টানা-পোড়েনে ঢাকা পড়েছে সে খাদ।

এর মধ্যে দেখা দিল আরেক সমস্যা। কয়েকজন বিজ্ঞানী বললেন, পৃথিবীর ওপর এমন বড় আকারের জীবধ্বংস যে শুধু একবারই ঘটেছে তা

নয়। ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষা থেকে মনে হয় এমনি ব্যাপক আকারে জীবধ্বংস ঘটেছে বার বার—মোটামুটি দু'কোটি ষাট লাখ বছর পর পর। কিন্তু এমন ছক বেঁধে মহাকাশ থেকে উল্কাপিন্ড বা আর কোন বস্তু কেন এসে পড়বে তার হদিস করা শক্ত হল।

রহস্যময় জুটি নক্ষত্র

আশির দশকের শুরুতে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রিচার্ড মিলার নামে একজন পদার্থবিদ এরও একটি ব্যাখ্যা তৈরি করলেন। তিনি বললেন, নক্ষত্রদের মোটামুটি অর্ধেকই দেখা যায় দু'টি করে জুটি বাঁধা। এমনও তো হওয়া সম্ভব যে, আমাদের সূর্যের চারপাশে ঘোরে জুটি বাঁধা এক অনুজ্জ্বল নক্ষত্র। সেই অদৃশ্য নক্ষত্রের তিনি একটি নামও রাখলেন—নেমেসিস। মিলারের কল্পিত এই নক্ষত্রের ভর সূর্যের এক-তৃতীয়াংশ, উজ্জ্বলতা সূর্যের চেয়ে হাজার ভাগের একভাগ।

আগেই জানা গিয়েছিল, সৌরজগতের বাইরের দিকে সূর্য থেকে প্রায় পনের লক্ষ কোটি কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়ানো আছে অগুনতি ধূমকেতুর পিন্ড—এই ধূমকেতু পুঞ্জের নাম দেয়া হয়েছে উর্ট মেঘ। হয়তো নেমেসিস নক্ষত্রটি সূর্যের চারপাশে ঘোরে অতি লম্বা উপবৃত্তাকার পথে—সেটি লম্বায় প্রায় তিন আলোক বছর। আর আড়াই থেকে তিন কোটি বছর পর পর এটি এসে পড়ে উর্ট মেঘের ভেতরে। তখন এই তারার টানে হয়তো একশ' কোটি ধূমকেতু ছোটে সূর্যের দিকে। তারই একটি দু'টি এসে পড়ে পৃথিবীর ওপর। আর এজন্যই মোটামুটি ২·৬ কোটি বছর পর পর পৃথিবীর ওপর ঘটে এক প্রচন্ড ধ্বংসলীলা। জ্যোতির্বিদরা আকাশে নেমেসিস নক্ষত্রের জন্য খোঁজাখুঁজি করছেন, কিন্তু এখনও তার কোন হদিস মেলে নি।

এই হিসেব অনুযায়ী এরপর এরকম ধ্বংসকান্ড ঘটতে পারে আজ থেকে ১·৩ কোটি বছর পর। অবশ্য তত্ত্বটি যদি ঠিক হয় আর নেমেসিস যদি সত্যি থেকে থাকে তাহলে তার আগেও এমন ঘটে যাবার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

কিন্তু সাড়ে ছ'কোটি বছর আগের সেই দুর্যোগে ডাইনোসররা কি একেবারেই নির্বংশ হয়ে গিয়েছিল ? গত শতাব্দীতে ডাইনোসরদের সাথে একটা অদ্ভুত প্রাণীর ফসিল পাওয়া যায়। এ যেন ডাইনোসর আর

পাখির মিশেল। এরা হাঁটত পাখির মতো দু'পায়ে। সামনের দু'টো ডানায় ছিল পালক, লেজও ছিল পালকওলা। অথচ এদের হাড়ের গড়ন সরীসৃপ বা গিরগিটিদের মতো, মুখে ছিল ধারালো দাঁত।

এতে বোঝা যায় আজ থেকে মোটামুটি চোদ্দ কোটি বছর আগে ডাইনোসরদের মধ্যে এক দল বদলে গিয়ে পাখির চেহারা নিচ্ছিল। দেহে পালক থাকায় মনে হয় এদের গায়ের রক্ত ছিল গরম, হয়তো এরা দরকার মতো শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণও করতে পারত। এদের নাম দেয়া হয়েছে আরকেওপ্টেরিক্স—অর্থাৎ আদিম পাখি।

প্রবল শীতে ডাইনোসররা মারা পড়লেও তাদের বংশধর পাখিরা গিয়েছে টিকে। টিকেছে গিরগিটি, সাপ, কুমির এসব সরীসৃপ। আর টিকেছে সেই আদি স্তনাপায়ী প্রাণীরা।

স্তন্যপায়ীদের মধ্য থেকেই ক্রমে ক্রমে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু সেজন্য আরো বহু, বহু বছর সময় লেগেছে। প্রথম ডাইনোসরদের শুরু, আজ থেকে অন্তত বিশ কোটি বছর আগে। আর কোন রকম করে মানুষ বলে চেনা যায় এ রকম প্রাণী পৃথিবীতে এসেছে বিশ লাখ বছরও হয় নি।

ভাগ্যিস ডাইনোসররা মারা যাবার সময় স্তনাপায়ীরা টিকে গিয়েছিল। তা নইলে মানুষই কি আজ থাকতো পৃথিবীতে!

ডিসেম্বর, ১৯৮৬

হারিয়ে যাওয়া আটলান্টিস

বিজ্ঞানীরা শুধু যে বর্তমান কালের বিষয় নিয়ে কাজ করেন তা নয়; বর্তমানকে বুঝতে হলে জানতে হয় পুরনো দিনের কথা। তাই অনেক সময় অতি প্রাচীন কালের বিষয়ও হয় তাঁদের চর্চার বস্তু। প্রাচীন কালের বিষয়ে তাঁরা কখনো জানতে পান প্রত্যক্ষ প্রমাণ থেকে, আবার কখনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় অতি সামান্য—অপ্রত্যক্ষ তথ্য থেকে যুক্তির সিঁড়ি বেয়ে সত্যকে উদ্ধার করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

অনেক সময় পুরাকালের বিষয় জানা যায় কিংবদন্তীর মাধ্যমে। পুরনো দিনের বিষয় নিয়ে অনেক কিংবদন্তী চালু আছে নানা দেশে। এসব কিংবদন্তী কেউ কেউ নেয় কাহিনী হিসেবে; আবার অনেকে এগুলোকে বিশ্বাস করে সত্যি বলে। বিজ্ঞানীরা নানা প্রমাণ আর যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার করে এসব থেকে প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করতে চেষ্টা করেন।

এমনি এক কিংবদন্তী হল প্রাচীন জনপদ আটলান্টিসের কাহিনী। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ৩৫০ খৃঃ পূঃ সালে 'টিমেয়ুস' নামে এক সংলাপে লিখেছেন এর কথা: 'হারকিউলিসের স্তম্ভ' নামে যে প্রণালী (আজকের জিবরালটার প্রণালী?) তার বাইরের সমুদ্রে এককালে ছিল এক বিশাল দ্বীপ। তার আয়তন ছিল এশিয়া মাইনর আর লিবিয়া যোগ করলে যা হয় তার চেয়েও বড়। এই আটলান্টিস দ্বীপে ছিল অপরূপ আর সমৃদ্ধ এক রাজ্য।

এক উন্নত সভ্যতা?

'ক্রিটিয়াস' নামে আরেক সংলাপে প্লেটো যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে মনে হয় এই দ্বীপের আয়তন ছিল প্রায় বাংলাদেশের তিনগুণ, লোকসংখ্যা ছিল প্রায় দু'কোটি; আর এর জলবায়ু ছিল প্রায় উষ্ণমণ্ডলের মতো। এর উত্তরে ছিল উঁচু পর্বতমালা; সে দেশের লোকেরা মনে করত এই সব নির্জন পর্বতের সবচেয়ে উঁচু ষেটি তাতে বাস করেন

দেবতারা। এই দ্বীপে ছিল অসংখ্য উষ্ণ নির্ঝর। এর উর্বর জমিতে জন্মাত নানা জাতের গাছপালা; বনে ছিল হাতি এবং অন্যান্য নানা জাতের প্রাণী। সরস জমিতে জলসেচের মাধ্যমে বছরে ফলত দুটি ফসল আর অসংখ্য খাল দিয়ে আনা-নেয়া হত নানা পণ্য। এর রাজধানীতে ছিল দেবতা পসিডনের বিশাল মন্দির। রাজধানীর প্রাসাদ আর মন্দিরের গায়ে জ্বলজ্বল করত সোনা-রুপো; আর তার চারদিক ঘেরা ছিল রোঞ্জ-মোড়া বিশাল দেয়াল আর পরিখা দিয়ে। বড় বড় রাজপথের চত্বরে ছিল বিশাল সব ভাস্কর্যমূর্তি।

প্লেটো বলেছেন খ্রীঃ পূঃ ১২,০০০ থেকে ৯,০০০ সাল পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার বছর আটলান্টিসের সভ্যতা ছিল সে অঞ্চলের সবচেয়ে উন্নত—এই সাম্রাজ্যের অধিকারের এলাকা বিস্তৃত ছিল উত্তর আফ্রিকায় মিসর পর্যন্ত আর ইউরোপে ইতালী পর্যন্ত। এদেশের লোকেরা গড়ে তুলেছিল ভ্রাতৃত্ব আর নৈতিকতায় বিশ্বাসী এক উন্নত সভ্যতা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পার্থিব সম্পদ আর ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় এলাকাকে দাসত্ব-শৃংখলে আবদ্ধ করার চেষ্টা করতে থাকে। গ্রীকদের পূর্বপুরুষেরা গ্রীস থেকে হটিয়ে দেয় তাদের—সম্মুখ যুদ্ধে হারিয়ে দেয় আটলান্টিসের বাহিনীকে।

তারপর আটলান্টিসের ওপর নেমে আসে দেবতার অভিশাপ। একদিন আকস্মাৎ প্রবল দুর্যোগময় এক রাতে উত্তাল সমুদ্র গ্রাস করে নেয় আটলান্টিস সভ্যতাকে। সেই সাথে মাটির নিচে তলিয়ে যায় গ্রীক বাহিনীও। কিন্তু ওভাবে আটলান্টিস ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কাহিনী কি কেবলই কিংবদন্তী না এর পেছনে রয়েছে কোন সত্য?

যুগে যুগে বহু পন্ডিত আর বিজ্ঞানী এ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। আটলান্টিস নামে বিশাল দ্বীপটির অবস্থান কোথায় ছিল তা নিয়েও নানা মুনির মধ্যে আছে নানা মত। কেউ বলছেন এটি সম্ভবত ছিল কিউবার উত্তরে আজ যেখানে বাহামা দ্বীপপুঞ্জ সেখানে। কেউ বলছেন এই দ্বীপ ছিল পর্তুগালের চার-পাঁচশ কিলোমিটার পশ্চিমে। কেউ বলছেন এটি ছিল গ্রীসের কাছাকাছি ঈজিয়ান সাগরে। আবার কারো মতে এটি ছিল ভূমধ্যসাগরে সাইপ্রাস, সিসিলি আর ক্রীটের কাছাকাছি। ক্রীট দ্বীপের উত্তর প্রান্তে প্রত্নতত্ত্ববিদরা আগ্নেয় ভস্ম আর লাভার তলায় কিছু প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন। এই দ্বীপের প্রায় ১১০ কিলোমিটার উত্তরে হারিয়ে যাওয়া আটলান্টিস

সানটোরিন দ্বীপমালার আগ্নেয় উদগারেই এই ধ্বংসকান্ড ঘটেছিল বলে অনুমান করা যায়।

নতুন ব্যাখ্যা

অটো হাইনরিখ মুক নামে এক জার্মান পন্ডিত 'আটলান্টিসের রহস্য' নামে এক বইতে এই সমস্যার ওপর কিছু নতুন আলোকপাত করেছেন। মুক রকেটবিদ্যা, সাবমেরিন, ভূপদার্থবিদ্যা, ইতিহাস ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে গবেষণা করেছেন। আটলান্টিস সম্পর্কে তিনি বলছেন, প্লেটো যাকে হারকিউলিসের প্রণালী বলে উল্লেখ করেছেন, সেটা খুব সম্ভব আজকের জিবরালটার প্রণালী। তাহলে জিবরালটার থেকে ১২০০ কিলোমিটার পশ্চিমে আজ যেখানে অ্যাজোর্স দ্বীপমালা সেখানেই সম্ভবত ছিল আটলান্টিস। বলা হয়েছে আটলান্টিসের উন্নত সভ্যতা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল; অথচ সে সময়ের ইউরোপে বাস করত আদিম নিয়ান্ডারথাল মানব; তারা তৈরি করত অতি প্রাথমিক ধরনের মাটির পাত্র আর পাথরের অস্ত্র। তখনও পৃথিবীর কোথাও ধাতুর বা চীনামাটির ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল বলে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায় নি।

অবশ্য এরপর পরই এসেছিল উন্নততর ক্রো-ম্যানিয়ন মানব। তারা ছিল নিয়ান্ডারথালদের চেয়ে লম্বা, গৌরবর্ণ। তাদের তৈরি অলংকার, অস্ত্রশস্ত্র, তৈজসপত্র ছিল নিয়ান্ডারথালদের চেয়ে অনেক উন্নত। স্পেন আর ফ্রান্সের গুহাগাত্রে এদের তৈরি অপূর্ব সুন্দর চিত্রকলা দেখতে পাওয়া যায়। মুক বলছেন, সম্ভবত আটলান্টিস থেকেই এই ক্রো-ম্যানিয়ন মানুষের উদ্ভব।

মনে রাখতে হবে খ্রীঃ পূঃ পঞ্চাশ হাজার থেকে এগার হাজার সাল পর্যন্ত ইউরোপের প্রায় সবটা ছিল পুরু বরফে ঢাকা। সম্ভবত তখন আটলান্টিস দ্বীপে বাধা পেয়ে উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত উত্তর দিকে না গিয়ে ঘুরে দক্ষিণে চলে যেত। এর ফলে আটলান্টিসের জলবায়ু হয়ে উঠেছিল আশ্চর্যরকম উষ্ণ আর মনোরম; আর তাতে সেখানে এক উন্নত সভ্যতার বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। আর হয়তো এখানকার বাসিন্দারাই প্রাচীনকালে যোগ স্থাপন করেছিল মিসর আর মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার সভ্যতার মধ্যে। মিসরের পিরামিডের সাথে আমেরিকার আদি বাসিন্দা মায়াদের তৈরি পিরামিডের আশ্চর্য

মিল দেখা যায়। স্পেনের বাস্ক ভাষার সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় গুয়াতেমালার আদিবাসী মায়াদের ভাষার।

আটলান্টিসের অবস্থান থেকে ইউরোপীয় ঈল মাছের রহস্যজনক আচরণের একটি ব্যাখ্যাও মুক দিয়েছেন। অ্যাজোর্সের দক্ষিণ-পশ্চিমে সারগাসো সাগরে এসব ঈল মাছ ডিম পেড়ে বাচ্চা তোলে। তারপর সে সব বাচ্চা উপসাগরীয় স্রোতে ভর করে তিন বছরের লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছয় ভূমধ্যসাগরে। পথে নানা রকম সামুদ্রিক প্রাণীর শিকার হয়ে প্রাণ দেয় অধিকাংশ ঈল। ইউরোপে যারা পৌঁছয় তারা ঢোকে নানা মিষ্টি পানির নদীতে। তারপর দশ-পনের বছর পরে ডিম পাড়ার সময় হলে তারা আবার ফিরে যায় সেই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সারগাসো সাগরে।

মুক বলছেন, হয়তো এককালে আটলান্টিসের উষ্ণ আর মিষ্টি পানির নদী ছিল সারগাসো সাগরের খুব কাছেই। এখানে এসে ঈল মাছেরা সমুদ্রের নানা শিকারী প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা পেত। ক্রমে ক্রমে ব্যাপারটা তাদের এমনই সহজাত প্রবৃত্তিতে পরিণত হয় যে, আজ আটলান্টিস না থাকলেও তারা হাজির হচ্ছে দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে ইউরোপের নানা নদী আর খাঁড়িতে।

ধ্বংসের সম্ভাব্য কারণ

প্লেটো বলেছেন আটলান্টিস তলিয়ে গিয়েছিল সাগরের নিচে। কিন্তু তলিয়ে কোথায় গেল এই বিশাল দ্বীপ? আজকের বিজ্ঞানীরা জেনেছেন আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত রয়েছে এক বিশাল ফাটল—সেটা ছড়ানো উত্তরে আইসল্যান্ড থেকে দক্ষিণে কুমেরু মহাদেশ পর্যন্ত। এই ফাটলের দু'পাশে রয়েছে প্রায় দেড় কিলোমিটার উঁচু পাড়। অ্যাজোর্স দ্বীপের কাছে এই পাড় হয়ে দাঁড়ায় বিশাল এক ঢিবি—পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রায় চারশ' কিলোমিটার চওড়া, উত্তর-দক্ষিণে প্রায় এগারশ' কিলোমিটার লম্বা। উত্তর দিকে উঁচু জলমগ্ন আগ্নেয় পর্বতমালা।—তারই কিছু কিছু অংশ পানির ওপর মাথা চাড়া দিয়েছে অ্যাজোর্স দ্বীপমালা হিসেবে। প্লেটো আটলান্টিসের যে বিবরণ দিয়েছেন তার সাথে পানির তলায় এই ঢিবির চেহারা যেন খানিকটা মিলে যায়।

১৯৩০ সালে আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে দক্ষিণ ক্যারোলিনা অঙ্গরাজ্যে চার্লস্টন শহরের কাছে বিমান থেকে এক জরিপে দেখা যায়

হাজার তিনেক গোল আর ডিম্বাকার খাদ। এসব খাদের সবগুলোরই দক্ষিণ-পূর্বে পাড় উঁচু হয়ে ওঠা। পরে দেখা গেল আরো দক্ষিণ-পূর্বে সমুদ্রের তলায় বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে আরো বড় বড় এমনি অসংখ্য খাদ। প্লেটো লিখেছেন "তারার কক্ষচ্যুতি ঘটে আর পৃথিবীর বুকে সব কিছু আগুনে ধ্বংস হয়ে যায়।" মুক বলছেন আসলে হয়তো কক্ষচ্যুত হয়ে অ্যাডোনিস গ্রহাণুগুচ্ছ থেকে ছুটে এসেছিল একটি গ্রহাণু। সমুদ্রের তলার পোর্টোরিকো খাদের আকার থেকে মনে হয় প্রায় দশ কিলোমিটার চওড়া এই দানব গ্রহাণু উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ছুটে এসে পড়েছিল এখানে। এর দু'টি বিশাল টুকরো ভেঙ্গে পড়ে সাগরের বুকে—তাতেই সৃষ্টি হয় পোর্টোরিকো খাদের। ছোট ছোট কিছু খন্ড পড়েছিল ডাঙ্গায় চার্লস্টনের কাছে।।

এই গ্রহাণুর আর দু'টি বড় খন্ড আঘাত হানে মাঝ-আটলান্টিকের ফাটলের ওপর। এই প্রচন্ড আঘাতে ফাটলের সবগুলো আগ্নেয়-গিরিতে উদগার আরম্ভ হয়। প্রচন্ড আলোড়নে কেঁপে উঠতে থাকে আটলান্টিস। মন্দির, বাড়ি-ঘর ধ্বসে পড়তে থাকে। আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করতে থাকে সব কিছুকে। প্রবল গলন্ত লাভার প্রবাহ উথলে ওঠে। জ্বলন্ত বাষ্প আর ছাই ছিটকে উঠে ঢেকে দেয় সারা পৃথিবীর আকাশ। মাত্র চব্বিশ ঘন্টা সময়ের মধ্যে তলিয়ে যায় আটলান্টিস। শুধু সমুদ্রের বুকে জেগে থাকে লাভায় ঢাকা অ্যাজোর্সের ন'টি ছোটখাট শৃঙ্গ।

সারা পৃথিবী জুড়ে যে কালো মেঘ ছড়িয়ে পড়ে তা বহু বছর ধরে আড়াল করে দেয় সূর্যের আলো। সম্ভবত গ্রহাণুর আঘাতে পৃথিবী হেলে পড়ে এক পাশে। উত্তর মেরু কাত হয়ে পড়ায় পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলে নেমে আসে প্রবল শীতের প্রকোপ। তাতেই মৃত্যু ঘটে সাইবেরিয়ার বিশাল সব ম্যামথদের। যে বিপুল কালোমেঘের সৃষ্টি হয় তার প্রবল বর্ষণে দেখা দেয় এক মহাপ্লাবন। পৃথিবীর নানা দেশের পুরাকাহিনীতে এই মহাপ্লাবনের বিবরণ পাওয়া যায়। এই মহাপ্লাবন কাটিয়ে যেসব মানুষ বেঁচে থাকে তাদের বহু শত বছর ধরে ঘন কালো মেঘে ঢাকা আকাশের নিচে দুঃসহ জীবন যাপন করতে হয়।

অবশেষে খ্রীঃ পূঃ চার হাজার সালের কাছে যখন আবার সভ্যতার যাত্রা শুরু হয় তখন আটলান্টিসের সকল চিহ্ন পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গিয়েছে। তার কাহিনী হয়ে দাঁড়িয়েছে কেবল কিংবদন্তী।

অবশ্য হাইনরিখ মুক-এর এই তত্ত্ব আটলান্টিস সম্বন্ধে সব সন্দেহের নিরসন করবে এমন কথা বলা শক্ত। প্লেটো বর্ণিত আটলান্টিসের কাহিনীর সত্যতায় প্লেটোর জীবনকালেই কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে 'ভূগোলের জনক' বলে পরিচিত স্ট্রাবো'র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্লেটোর মৃত্যুর পরও এ কাহিনীর নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে বিতর্ক চলছে প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে।

কাহিনীর উৎস

এই কাহিনীর উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল তা একটু খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে কেন এই কাহিনী সম্বন্ধে এমন সংশয় গোড়া থেকেই দেখা দিয়েছে।

প্লেটো ছিলেন মূলত একজন দার্শনিক। বলা চলে সেকালের সবচেয়ে নামী দার্শনিক। তিনি ছিলেন সক্রেটিসের শিষ্য এবং সেকালের সেরা বিজ্ঞানী অ্যারিস্টটলের গুরু। জীবনের শেষ দিকে তাঁর প্রধান চর্চার বিষয় ছিল রাষ্ট্রের প্রকৃতি। এক দিকে তিনি বর্ণনা করেছেন আদর্শ রাষ্ট্র, অন্য দিকে দেখাতে চেয়েছেন তার বিপরীত ধরনের রাষ্ট্র—যা সমগ্র পৃথিবীকে বাহুবলে পদানত করতে চায়। আটলান্টিস হল এমনি এক রাষ্ট্র। তাঁর কল্পিত এই দু'ধরনের রাষ্ট্রকে দুই বিপরীতধর্মী 'ইউটোপিয়া' বা কল্পলোক বলে মনে করা যেতে পারে।

প্লেটো তাঁর দার্শনিক মতামত প্রকাশ করেছেন মূলত বিভিন্ন চরিত্রের মুখ দিয়ে সংলাপের আকারে। তাঁর বর্ণনামতো এথেন্সের অভিজাত পুরুষ এবং বৃদ্ধ কবি ক্রিটিয়াস (প্লেটোর পিতামহ) এর গৃহে দার্শনিকদের ঘটেছিল এক সমাবেশ। পণ্ডিতজনেরা দু'দিন ধরে দর্শন, রাজনীতি এথেন্সের অতীত ও বর্তমান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলেন। এই সময়ে আকস্মাৎ ক্রিটিয়াস আটলান্টিসের আশ্চর্য কাহিনী বলতে শুরু করলেন। এই কাহিনী ক্রিটিয়াস শুনেছিলেন তাঁর মায়ের এক পূর্বপুরুষ সোলোনের কাছে; সোলোন শুনেছিলেন এক মিসরীয় পুরোহিতের কাছে। সোলোন বেঁচে ছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ সপ্তম শতকে; আটলান্টিসের ঘটনা ঘটেছিল তারও ন'হাজার বছর আগে।

হিসেব করলে দেখা যায় ক্রিটিয়াসের গৃহে দার্শনিকদের এই

সমাবেশ যখন ঘটেছিল তখন প্লেটোর বয়স ছিল মাত্র ছ'বছর। অথচ প্লেটোর তিনটি বিখ্যাত সংলাপ (রিপাবলিক, ক্রিটিয়াস, টিমেয়ুস) সবই রচিত হয় তাঁর একেবারে বার্ধক্যের পর্যায়ে (তাঁর জীবনকাল খ্রীঃ পূঃ ৪২৭-৩৪৭)। মাত্র ছ'বছর বয়সে শোনা কাহিনী অত্যন্ত পরিণত বয়সে হুবহু বর্ণনা করতে গেলে তা তেমন তথ্যনিষ্ঠ না হওয়াই সম্ভব। তাছাড়া প্রাচীন গ্রীক বা রোমক পুরাকাহিনীতে আটলান্টিস নামে কোন দ্বীপের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষায় দেখা যায় মাঝ-আটলান্টিক সমুদ্রতলের ফাটলে শিলার বয়স মোটামুটি দশ থেকে পনের কোটি বছর। সমুদ্রতলে যে পাললিক স্তর তাও বহু লক্ষ বছরের পুরনো। তার মধ্যে ১১,৫০০ বছর আগে কোন দ্বীপ আকস্মিক তলিয়ে গিয়েছে এমন কিছু চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া এই সময়কার মানুষ ছিল পুরনো প্রস্তর যুগে; সে যুগে আটলান্টিসের মতো একটি উন্নত সভ্যতার অস্তিত্ব মানুষের ঐতিহাসিক জ্ঞানের সঙ্গে মোটেই সঙ্গতপূর্ণ নয়।

তবে কি প্লেটো নিতান্তই তাঁর দার্শনিক তত্ত্বের দৃষ্টান্ত হিসেবে আটলান্টিসের কাহিনীটি রচনা করেছিলেন? প্লেটোর প্রিয় শিষ্য অ্যারিস্টটল এক জায়গায় বলেছেন, "যিনি একে সৃষ্টি করেছিলেন তিনিই একে বিলুপ্ত করেছেন।" প্লেটো আটলান্টিসকে ধ্বংস করেছিলেন তার কারণ, তাঁর মতে, "মানুষকে অনুসরণ করতে হবে মঙ্গল ও ন্যায়ের নীতি"। আর তাই দেবতা জিউসের ক্রুদ্ধ অভিশাপে এই বিশাল দ্বীপকে গভীর সমুদ্রে ডুবতে হয়েছিল—সেখানকার লোকের "নিষ্ঠুরতা আর যুদ্ধপ্রিয়তার জন্য তাদের প্রচণ্ড লোভ আর ন্যক্কারজনক পাপ"-এর শাস্তি হিসেবে।

আগস্ট, ১৯৮৩

সাইবেরিয়ার আশ্চর্য আলো

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে খুব বড় রকম বিস্ফোরণের কথা শুনলে কেউ আর তেমন আশ্চর্য হয় না। ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকির ওপর যে পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছিল তার শক্তির পরিমাপ করা হয়েছিল কিলোটন (হাজার টন)-এর হিসেবে, অর্থাৎ তার এক একটির শক্তি ছিল কয়েক হাজার টন টি, এন, টি, বিস্ফোরকের ধ্বংসক্ষমতার সমান। কিন্তু তারপর কিছুদিনের মধ্যেই এলো হাইড্রোজেন বোমার মেগাটন বিস্ফোরণ—যার ধ্বংস-ক্ষমতা কয়েক মিলিয়ন (নিযুত) টন টি, এন, টি, বিস্ফোরকের সমান।

কিন্তু পরমাণু-বোমা সৃষ্টির অনেক আগে এই শতকের গোড়ায় পৃথিবীর বুকে ঘটেছিল এক আশ্চর্য রকম প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। এমন বিস্ফোরণ যার শক্তি হিরোশিমার বিস্ফোরণের চেয়ে কম করেও হাজার গুণ বেশি; অর্থাৎ একটা বেশ বড়সড় হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের সমান। আর ঠিক কি কারণে বা কিভাবে এই বিস্ফোরণটি ঘটেছিল তা নিয়ে দুনিয়ার নানা দেশের বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালাচ্ছেন গত প্রায় এক শতাব্দী ধরে।

অদ্ভুত এক বিস্ফোরণ

ঘটনাটা ঘটেছিল সাইবেরিয়ার উত্তরে তুঙ্গুসকা নদীর ধারে এক জন-বিরল গভীর বনে—১৯০৮ সালের ৩০শে জুন তারিখে। জায়গাটা বৈকাল হ্রদের কাছাকাছি শহর ইরকুটস্ক থেকে প্রায় ৯৫০ কিলোমিটার (৫৯০ মাইল) উত্তরে। মেরুবৃত্তের কাছাকাছি এই চিরহিম বনাঞ্চলে বাস করে হাজার হাজার বলগা-হরিণ আর অল্প সংখ্যক তুঙ্গুস উপজাতির লোক।

ঘটনার দিন স্থানীয় সময় সকাল সাতটা কেবলই বেজেছে। কাছাকাছি এলাকার চাষী, শিকারী আর ভেড়েরা চমকে উঠল অসংখ্য কামানের

গর্জনের মতো দূরাগত এক প্রচণ্ড শব্দে। আকস্মাৎ আকাশ দিয়ে ছুটে গেল যেন সূর্যের চেয়ে বড় অতি উজ্জ্বল এক অগ্নিপিণ্ড। এরপরই তুঙ্গুসকা নদীর ধারে ভানাভারা গ্রামের লোকেরা দেখল উত্তরের দিগন্ত থেকে ওপর দিকে উথলে উঠছে ব্যাঙের ছাতার আকারের বিশাল এক তীব্র আলোর ফোয়ারা। পরে এই গ্রামের একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছিল, আগুনের তাতে মনে হচ্ছিল তার পিঠের জামায় আগুন ধরে গিয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে ভানাভারা গ্রাম প্রায় ষাট কিলোমিটার দূরে। এমনি আলোর ঝলক দেখা গেল শত শত কিলোমিটার দূর থেকেও। আগুনের হলকায় বহু দূর পর্যন্ত ঝলসে ছাই হয়ে গেল গাছপালা। কোথাও কোথাও জ্বলে উঠল দাবানল।

তার পর পরই আশপাশের বহু দূর পর্যন্ত এলাকা দিয়ে বয়ে গেল এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়। প্রবল হাওয়ার তোড়ে ভেঙ্গে পড়ল গাছপালা, উড়ে গেল বাড়ির চাল, ঝন ঝন করে ভেঙ্গে পড়ল ঘরের জানালা। ছ'শ কিলোমিটার দূরে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথে যাচ্ছিল এক ট্রেন। মাটি প্রচণ্ডভাবে কাঁপতে দেখে চালক ব্রেক কষে থামিয়ে ফেলল ট্রেনটি। মাটির কাঁপুনি ধরা পরল দূরপ্রাচ্য আর ইউরোপের ভূকম্প-কেন্দ্রগুলোতে।

পরে জানা গিয়েছিল তুঙ্গুসকার প্রচণ্ড বিস্ফোরণে হাওয়ার কাঁপন দুদু'বার বেড় দিয়ে এসেছে সারা পৃথিবী। এই কাঁপন ধরা পড়েছে লণ্ডনেও। প্রচণ্ড তাপে মুহূর্তের মধ্যে জমাট বরফ গলে যাওয়ায় কাছাকাছি আঙ্গারা এবং অন্যান্য নদীর পানি ফুলে উঠল বিশাল ঢেউ তুলে।

এর পর বেশ ক'দিন ধরে ইউরোপের নানা দেশের লোক আশ্চর্য হতে লাগল অদ্ভুত আলোকিত রাত আর বিচিত্র ভোরের আকাশ দেখে। গভীর রাত অতি উঁচু আকাশে ফুটে উঠত উজ্জ্বল রুপোলী মেঘ। প্যারিসে কৃষ্ণপক্ষের রাতেও লোকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়তে পারত খবরের কাগজ আর মস্কোয় দুপুর রাতেও তোলা চলত আলোকচিত্র।

সে সময়ে সাইবেরিয়ার দুর্গম তাইগা অঞ্চলের সাথে সভ্য জগতের যোগসূত্র ছিল না বললেই চলে। সাইবেরিয়ার এই আশ্চর্য আলোর খবর তাই তুঙ্গুস উপজাতিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে নানা রকম লোককথা আর কল্পকাহিনীর জন্ম দিতে লাগল। ক্রমে ক্রমে বিশাল এলাকা জুড়ে বিধ্বস্ত বনাঞ্চলে এক ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপের ওপর গজাতে লাগল আগাছা আর ঘাস।

১৯২১ সালে লেনিনগ্রাদের খনিজবস্তু জাদুঘরের বিজ্ঞানী লিওনিদ কুলিক সাইবেরিয়ার এক পুরনো স্থানীয় পত্রিকা থেকে কি করে একদিন জানতে পেলেন এই আশ্চর্য আলোর খবর। তিনি সোভিয়েত সরকারের কাছে প্রস্তাব দিলেন এই ঘটনার রহস্য সন্ধানের জন্য একটি অভিযান পাঠাবার। নতুন সোভিয়েত সরকার তখন অর্থনৈতিক সংকট, দুর্ভিক্ষ আর গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত। তবু সোভিয়েত আমলে এই প্রথম একটি বৈজ্ঞানিক অভিযানের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হল।

প্রথম বৈজ্ঞানিক অভিযান

কুলিকের নেতৃত্বে অভিযাত্রী দল একদিন লোকালয় থেকে বহু দূরে তুঙ্গুসকার বনাঞ্চলে এসে পৌঁছলেন। কিন্তু তাঁদের পক্ষে ঘটনাস্থল খুঁজে বের করাই দুঃসাধ্য হল। হাজার হাজার বর্গকিলোমিটার জুড়ে তাইগার দুর্গম বন। তার মধ্যে আছে অসংখ্য জলা, হিংস্র নেকড়ে, ভয়ংকর মশা। সেই বনে আগুনের দুরন্ত দেবতা 'অগদি'র অভিশাপ হিসেবে নেমে এসেছে প্রচণ্ড এক আগুনের গোলা আর তার সাথে বিরাট ধ্বংসলীলা। ভয়ে স্থানীয় লোকেরা কেউ সেদিকে ভুলেও যেত না।

তাঁবু, কম্বল, রসদ, যন্ত্রপাতি সাথে নিয়ে কোথাও ঘোড়ায় চেপে, কোথাও পায়ে হেঁটে হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে, নানা আধিব্যাধির সাথে লড়ে কুলিক বছরের পর বছর তাঁর অনুসন্ধান চালাতে লাগলেন। অবশেষে ১৯২৭ সালে ফেব্রুয়ারির তীব্র শীতে এক বিজন পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি দেখলেন এক আশ্চর্য দৃশ্য। উত্তরের দিকে বিশাল এক এলাকা জুড়ে লক্ষ লক্ষ গাছ মাটিতে লুটিয়ে আছে—যেন দিগন্ত জোড়া এক বিরাট কুঠারের একটি মাত্র কোপ তাদের সবাইকে ধরাশায়ী করে দিয়েছে। বিশাল সব পাইন, বার্চ, লার্চ, ফার প্রভৃতি চিরহরিৎ গাছ গোড়াসুদ্ধ উপরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী হয়ে। কিন্তু কুলিকের সাথে যে তুঙ্গুস উপজাতীয় গাইড ছিল সে আর কিছুতেই সেদিকে এগিয়ে যেতে রাজি হল না; কাজেই তাঁকে সেবারের মতো ফিরে আসতে হল ভানাভারায়।

পরের বছর কুলিক ক'জন সহযাত্রী নিয়ে আবার হাজির হলেন সেই জায়গায়। আশেপাশের জায়গা ভালমত জরিপ করে দেখা গেল বিশাল এলাকা জুড়ে ওপড়ানো গাছগুলোর গোড়া যেন একটা বৃত্তের

কেন্দ্রবিন্দুর দিকে ফেরানো। কুলিক বুঝলেন তাঁরা এক বিরাট বিস্ফোরণের কেন্দ্রস্থল খুঁজে পেয়েছেন।

তারপর তাঁরা আরো বহুবার এলেন এই জায়গায়। মাপজোখ করে ধ্বংসের ব্যাপকতার যে পরিচয় পাওয়া গেল তা প্রায় অবিশ্বাস্য। আমাদের পুরনো পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম আর নোয়াখালী জেলা একত্র করলে যতটা জায়গা হবে ততখানি এলাকা জুড়ে গাছপালা উপড়ে পড়েছে। তার মধ্যে পুরোপুরি বিধ্বস্ত এলাকা প্রায় নোয়াখালী জেলার সমান। তাছাড়া বিস্ফোরণের প্রবল তাপের ঝলকে ঝলসে ছাই হয়ে গিয়েছে কেন্দ্রস্থলের পনের থেকে আঠার কিলোমিটার দূর পর্যন্ত সব গাছপালা।

কুলিক অনুমান করলেন সম্ভবত একটি বিশাল উল্কাখণ্ড পড়ার ফলেই এই ধ্বংসকাণ্ডের সৃষ্টি। কিন্তু বড়সড় উল্কাপিণ্ড পড়লে সেখানে একটি বড় খাদ সৃষ্টি হবার কথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনায় একটি বিখ্যাত উল্কা-খাদ চওড়ায় প্রায় দেড় কিলোমিটার আর প্রায় দু'শ মিটার গভীর। তাছাড়া এমনি খাদের আশেপাশে উল্কাপিণ্ডের ধ্বংসাবশেষও থাকবার কথা। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সে অঞ্চলে ছোটখাট কিছু খাদ আর বড়সড় জলা ছাড়া প্রত্যাশিত বড় খাদের কোন হদিস কোথাও পাওয়া গেল না। বহু টন মাটি খুঁড়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে উল্কাপিণ্ডের অবশিষ্ট সামান্য একটি খণ্ডও কোথাও মিলল না।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল বিস্ফোরণের ঠিক কেন্দ্রস্থলে যেখানে থাকার কথা বিশাল খাদ, দেখা গেল সেখানে উদ্ধতভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিছু ডালপালাহীন বাকলশূন্য ঝলসানো গাছ।

১৯৩৮-৩৯ সালে আরো ভাল করে জরিপ চালাবার জন্য বিমান থেকে এলাকাটির ছবি নেয়া হল। কিন্তু তারপরই বেঁধে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। নাৎসী জার্মানী হামলা চালাল সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর। কুলিকও সেনাবাহিনীতে নাম লেখালেন। যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁর মৃত্যু হল।

কল্পকাহিনী আর বিজ্ঞান

১৯৪৫ সালে হিরোশিমা-নাগাসাকিতে ঘটল পরমাণু-বোমার প্রলয়ংকর বিস্ফোরণ। তার পরের বছর আলেকজান্ডার কাজান্তসেভ নামে একজন লেখক তুঙ্গুসকার ঘটনা নিয়ে এক কল্পকাহিনী ফাঁদলেন। সেই লেখায়

তিনি দেখালেন যেন ১৯০৮ সালে মহাকাশের মঙ্গল বা এ জাতীয় আর কোন গ্রহ থেকে পরমাণু-শক্তিচালিত নভোযানে চেপে কোন আগন্তুক এসেছিল পৃথিবীতে। সাইবেরিয়ায় নভোযানটি নামাতে গিয়ে যান্ত্রিক গোলযোগে সেটি বিধ্বস্ত হয় তুঙ্গুসকার বনে। পারমাণবিক বিস্ফোরণ বলেই সেখানে তার কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। আর বিস্ফোরণ মাটিতে না হয়ে ঘটেছিল কয়েক কিলোমিটার উঁচুতে, তাই সেখানে সৃষ্টি হয় নি তেমন বড় কোন খাদ। তাছাড়া খাড়া ওপর থেকে বিস্ফোরণের ঝাপটা এসেছিল বলে কেন্দ্রস্থলের নিচের গাছগুলোর শুধু ডালপালা ঝরে পড়েছে, আর দূরের গাছপালা প্রবল আঘাতের ঝাপটায় ধরাশায়ী হয়েছে চতুর্দিকে চল্লিশ-পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে পর্যন্ত।

বলা বাহুল্য বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই এই কল্পকাহিনীর ব্যাখ্যাকে তেমন আমল দিলেন না। কিন্তু সাইবেরিয়ার এই আশ্চর্য বিস্ফোরণের রহস্য নিয়ে প্রবল বিতর্ক চলতে থাকল। তার ফলে ১৯৩৮ সাল থেকে আবার শুরু হল তুঙ্গুসকার দিকে নানা বিজ্ঞানী দলের নিয়মিত অভিযাত্রা। তাঁদের একদল বললেন, আসলে তুঙ্গুসকায় পড়েছিল মহাকাশ থেকে ছিটকে আসা এক বিশাল ধূলোর পিণ্ড- হয়তো কোন ধূমকেতুর মাথায় জমাটবাঁধা বস্তু। আরেক দল বললেন, সেখানকার ধ্বংসস্থলের অবস্থার সবচেয়ে লাগসই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় পারমাণবিক বিস্ফোরণের মতটিকে মেনে নিলে।

সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির ভূতত্ত্ববিদ কিরিল ফ্লোরেনস্কির নেতৃত্বে এক অভিযাত্রী দল জায়গাটি তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে দেখলেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত হল সেখানে যা পড়েছিল সেটি একটি উল্কাপিণ্ডই, তবে তা মাটিতে বিস্ফোরিত হয় নি, হয়েছে হাওয়ায়। এই উল্কাপিণ্ডের অবশেষ বের করার জন্য প্রংখানুপুংখভাবে সন্ধান চালানো হল, কিন্তু আশপাশে কোথাও উল্কাপিণ্ডের কোন অবশিষ্ট মিলল না।

সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদিমির সভাপতি আকাদেমিশিয়ান ভাসিলি ফেসেনকভ এই বিজ্ঞানী দলের ব্যাখ্যার সাথে একমত হলেন না। তিনি বললেন, সাধারণ উল্কাপিণ্ড বা এমনকি অসাধারণ রকম বড় উল্কাপিণ্ডও ঠিক এ ধরনের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের কারণ হতে পারে বলে বিশ্বাস করা শক্ত। খুব সম্ভব আগন্তুক পিণ্ডটি ছিল একটি ছোটখাট ধূমকেতুই। সম্ভবত এর ব্যাস ছিল মাত্র কয়েক কিলোমিটার আর ওজন ছিল কয়েক লক্ষ টন। আর সেটি বিস্ফোরিত হয়েছিল

মিটার উঁচুতে। কিন্তু পৃথিবীর কাছাকাছি কোন ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটলে বিশাল পুচ্ছের জন্য সচরাচর বেশ আগে থেকেই তাকে দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই কোন রকম আগাম সংকেত না দিয়ে এভাবে একটি ধূমকেতুর সাথে পৃথিবীর সংঘর্ষ কি করে ঘটল এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না।

সাইকেলের চাকার শিকগুলো যেমন কেন্দ্র করে বাইরের দিকে চার পাশে ছড়িয়ে পড়ে, তুঙ্গুসকায় গাছগুলো ভেঙ্গে পড়েছে অনেকটা সেই ভাবে। অবশ্য তার কিছু ব্যতিক্রমও আছে। এর ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হল : আসলে হাওয়ায় ঘাত পড়েছে দু'বার। একবার যখন আগন্তুক বস্তু প্রচণ্ড বেগে ঢুকেছে হাওয়ার স্তরে, দ্বিতীয়বার যখন এটির বিস্ফোরণ ঘটেছে কেন্দ্রস্থলের ঠিক ওপরে। এসব হিসেব-নিকেশ ইলেকট্রনিক যন্ত্রগণকে বিশ্লেষণ করে আগন্তুক বস্তুর শেষ পর্যায়ের বেগ পাওয়া গেল প্রতি সেকেণ্ডে এক থেকে দুই কিলোমিটার। বিজ্ঞানীরা বললেন, এত কম বেগে ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটলে হাওয়ার ঘর্ষায় এমন প্রচণ্ড রকম বিস্ফোরণ সৃষ্টি হবার কথা নয়।

এ কি প্রতিপদার্থ ?

এই সময়ে কয়েকজন মার্কিন বিজ্ঞানী তেজস্ক্রিয় কারবন বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে বললেন, খুব সম্ভব মহাকাশ থেকে আবির্ভাব ঘটেছিল এক প্রতিপদার্থের পিণ্ডের। পার্থিব পদার্থের (হাওয়ার গ্যাস) সাথে সংঘর্ষে ঘটেছে পদার্থ আর প্রতিপদার্থের পারস্পরিক বিনাশ, আর তাতেই উদ্ভব ঘটেছে এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ শক্তির। আসলে তিরিশের দশকে প্রথম প্রতিপদার্থের কল্পনা করেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী পি, ই, এম, ডিরাক। সাধারণ পদার্থের পরমাণুতে থাকে পজিটিব বিদ্যুৎযুক্ত কেন্দ্র আর তার চারপাশে ঘোরে নেগেটিভ বিদ্যুৎযুক্ত ইলেকট্রন কণিকা। ডিরাক বললেন মহাকাশে এমন বস্তুও তো থাকা সম্ভব যার পরমাণু কেন্দ্র নেগেটিভ বিদ্যুৎযুক্ত, আর তার চারপাশে ঘুরছে পজিটিভ বিদ্যুৎযুক্ত পজিট্রন কণিকা। একেই বলা হল প্রতিপদার্থ।

বিলেতের বনেদি বিজ্ঞান পত্রিকা 'দ্য নেচার'-এ বেরুলো তুঙ্গুসকার বিস্ফোরণের এই প্রতিপদার্থজনিত ব্যাখ্যা, আর তা নিয়ে সৃষ্টি হল এক নতুন চাঞ্চল্য। ফ্লোরেনস্কি বললেন এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ১৯০৮ সালের বিস্ফোরণের পর সে এলাকায় তেজস্ক্রিয়

বৃদ্ধি পেয়েছে এমন কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা সবাই এ মত সমর্থন করলেন না। দেখা গেল তুঙ্গুসকা এলাকার যেসব গাছ ১৯০৮ সালের আগে থেকে এখনও বেঁচে আছে তাদের কান্ডে ঐ সময়ের কাছাকাছি বলয় সৃষ্টি হয়েছে অস্বাভাবিক রকম প্রশস্ত। বলা হল, সম্ভবত এটা তেজস্ক্রিয়ারই ফল।

পারমাণবিক বিস্ফোরণের ব্যাখ্যায় বড় রকম চাঞ্চল্য সৃষ্টি হবার আরো কারণ এই যে, তাহলে অনুমান করতে হয় ১৯০৮ সালে হয়তো মহাকাশ থেকে কোন বুদ্ধিমান প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছিল পৃথিবীতে। কেননা, তা নইলে অকস্মাৎ আপনা থেকেই পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটেছে এমনটা কল্পনা করা যায় না। তাছাড়া সৌরজগতের কোথাও প্রতিপদার্থ থাকবার সম্ভাবনা নেই; কাজেই যদি প্রতিপদার্থের আবির্ভাব ঘটে থাকে তবে তা নিশ্চয়ই এসেছে অতি দূর মহাশূন্যের কোন প্রান্ত থেকে। আর এভাবে মহাকাশের অজস্র বস্তু-পুঞ্জের বেড়াজাল ডিঙিয়ে দূর নক্ষত্রলোক থেকে একখন্ড প্রতিপদার্থের পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশের ব্যাপারটিও অবিশ্বাস্য মনে হয়। তবে কি কোন অতিবুদ্ধিমান প্রাণী প্রতিপদার্থচালিত যান নিয়ে হাজির হয়েছিল পৃথিবীর বুকে?

বিস্ফোরণ কেন্দ্রের কাছাকাছি গাছপালা ভেঙে পড়ার দিক নিয়েও রীতিমতো রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। গোড়ায় ধারণা করা হয়েছিল উড়ন্ত আলোকপিন্ডটি তুঙ্গুসকায় আঘাত হেনেছিল দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে; প্রত্যক্ষদর্শীদের আলোকপিন্ড দেখার বিবরণ তাই বলে। কিন্তু গাছের গুঁড়িগুলো যেভাবে শুয়ে পড়েছে তাতে মনে হয় বস্তুটি বনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। একদল বিজ্ঞানী বললেন, আসলে হয়তো প্রত্যক্ষদর্শীদের দেখাটা যেমন সত্যি, গাছেদের শুয়ে পড়াটিও তেমনি সত্যি। অর্থাৎ বস্তুটি প্রথমে ছুটে গিয়েছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। তারপর দিক বদলে গিয়েছে পশ্চিম থেকে পূর্বে, অবশেষে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ছুটে গিয়ে ভেঙে পড়েছে তুঙ্গুসকার বনে। কিন্তু চালকযুক্ত নভোযান ছাড়া কোন প্রাকৃতিক বস্তুর পক্ষে এভাবে দিক পরিবর্তন কি সম্ভব?

গত প্রায় পঁচিশ বছর ধরে প্রায় প্রতি বছরই বিজ্ঞানীরা নিয়মিত অভিযান চালিয়েছেন তুঙ্গুসকা এলাকায়। এসব অভিযানে যোগ দিয়েছেন ভূতত্ত্ববিদ, পদার্থবিদ, রসায়নবিদ, জ্যোতির্বিদ, গণিতবিদ, জীব-বিজ্ঞানী ইত্যাদি বিজ্ঞানের নানা বিভাগের অসংখ্য বিশেষজ্ঞ।

১৯৭৬ সালে এমনি এক বিশেষজ্ঞ দল সেখানকার জলার তলায় পীট কয়লার ভেতর পেলেন অতি সূক্ষ্ম সিলিকেট কণা। তাকে বিশ্লেষণ করে কিছু বিরল মৌল ও ভারি ধাতুর সন্ধান পাওয়া গেল। তাতে অ্যালুমিনিয়াম আর জিংক অক্সাইড পাওয়া গেল উচ্চ মাত্রায়। সাধারণ উল্কাপিন্ডে সচরাচর এমন দেখা যায় না। বিজ্ঞানীরা বললেন, এসব কোন ধূমকেতুপিন্ডের অবশিষ্ট হওয়া সম্ভব। এ ধরনের বস্তুকে বলা হয় 'কারবনসমৃদ্ধ কনড্রাইট।' সচরাচর ধূমকেতুর কেন্দ্রবস্তুতে এদের উপস্থিতি ঘটে।

তবে কি উল্কাপিন্ড?

কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ছ'বছর ধরে তুঙ্গুসকার রহস্য নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। ঐ এলাকার পীট কয়লা বিশেষ ধরনের উচ্চ-তাপ চুল্লির সাহায্যে বিশ্লেষণ করে তাতে অসংখ্য অতি কঠিন কাল রঙের সূক্ষ্ম কণা পাওয়া গেল। দেখা গেল এগুলো আসলে ছোট ছোট হীরকখন্ড। সচরাচর হীরক সৃষ্টি হয় পৃথিবীর গভীর অভ্যন্তরে প্রচণ্ড চাপে। আগ্নেয়গিরির উদগারের সাথে সে সব ভূতলে উঠে আসে আগ্নেয় শিলাদন্ডের অংশ হিসেবে। মহাশূন্যে ভাসমান বস্তুখন্ডের সংঘর্ষেও সৃষ্টি হতে পারে এমনি প্রচন্ড চাপের, আর তার ফলেও জন্মাতে পারে হীরক খন্ড। 'উরালাইট' নামে এক ধরনের উল্কাপিন্ডে সম্ভবত এ কারণেই হীরক কণার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তুঙ্গুসকা এলাকায় কোন আগ্নেয় শিলাদন্ডের হদিস পাওয়া যায় নি। কাজেই মহাকাশেই এসব হীরক কণার উৎপত্তি বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।

এসব পরীক্ষার ফলাফল থেকে সম্প্রতি কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত হল, আসলে মহাকাশের আগন্তুক বুদ্ধিমান জীব নয়, প্রতিপদার্থ অথবা খুদে 'ব্ল্যাক হোল' (কৃষ্ণ-গহ্বর) নয়, এমনকি ধূমকেতুর পিন্ডও নয়, আসলে তুঙ্গুসকার বিস্ফোরণ একটি উল্কাপিন্ড থেকেই ঘটেছিল। খুঁজে পাওয়া হীরক কণায় তেজস্ক্রিয় কারবন ১৪-এর মাত্রা থেকে উল্কাপিন্ডটির মোট ভরেরও একটা হিসেব করা হয়েছে। মনে হয় এর ভর ছিল অন্তত চার হাজার টন। বিজ্ঞানীরা বলেন, গড়পড়তা প্রতি একশ' বছরে এমন বড়

আকারের উল্কাখণ্ড পৃথিবীতে এসে পড়ে; তবে প্রায় সময়ই এসব পড়ে বিজন সাগর-মহাসাগরে, তাই তার কথা মানুষ জানতে পায় না।

কিন্তু এটা যদি উল্কাপিণ্ড হবে তাহলে অ্যারিজোনার বা পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় উল্কাপাতের ফলে যেমন বিরাট খাদের সৃষ্টি হয়েছে তেমন কোন খাদ তুঙ্গুসকায় পাওয়া যাচ্ছে না কেন? এর জবাবে কিয়েভের বিজ্ঞানীরা বলছেন, সচরাচর উল্কাপিণ্ড হয় ধাতব লোহার পিণ্ড। এটা ধাতব পিণ্ড না হয়ে ছিল এক বিরাট পাথরের চাঁই, তাই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘষায় মাটিতে পড়ার আগেই জ্বলে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। আর তার সূক্ষ্ম ভস্মকণা ছড়িয়ে-পড়েছে বিশাল এলাকা জুড়ে।

এই উল্কাখণ্ডটি কোথা থেকে এল সে সম্পর্কেও কিছুটা অনুমান করেছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে এটা আসলে 'এংকের ধূমকেতু' থেকে ছিটকে পড়া একটা খণ্ড। এংকের ধূমকেতু প্রায় প্রতি সোয়া তিন বছর পর পর পৃথিবীর কাছাকাছি এসে পৌঁছয়। এর গা থেকে ছিটকে পড়া বেশ কিছু খণ্ড ছড়িয়ে আছে সৌরজগতে। প্রতি বছর জুন মাসের শেষে পৃথিবী এই আবর্জনার স্তূপ পেরিয়ে যাবার সময় আকাশে উল্কাবৃষ্টি ঘটতে দেখা যায়। তুঙ্গুসকার ঘটনাটিও ঘটেছিল জুন মাসের শেষেই।

তাহলে এই সিদ্ধান্ত থেকে কি তুঙ্গুসকার রহস্যের চূড়ান্ত ইতি ঘটল?

সাটের দশকের মাঝামাঝি মার্কিন বিজ্ঞানীরা প্রতিপদার্থের আবির্ভাবের তত্ত্ব প্রচার করার পর সোভিয়েত সাময়িকী 'নেদেলিয়া' (সপ্তাহ) ভূতত্ত্ববিদ কিরিল ফ্লোরেনস্কির একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে। তাতে তিনি বলেছিলেন, মার্কিন বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা যতটা না বৈজ্ঞানিক তার চেয়ে বেশি হল চমক-লাগানো। তুঙ্গুসকায় কোন পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটে নি, এটা উল্কাপাতও নয়, ঘটনাটা নিঃসন্দেহে একটি ধূমকেতুর পতন।—খবরটির শিরোনাম দেওয়া হয়েছিল 'তুঙ্গুসকা রহস্যের অবসান'।

বলা বাহুল্য তখনও সে রহস্যের সত্যিকার অবসান ঘটে নি।—এতদিনে ঘটেছে কিনা তা একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারে।

অক্টোবর ১৯৮২

বিস্ময়কর রশ্মি—লেজার

লেজার রশ্মির কথা আপনি হয়তো আগেই শুনেছেন অথবা হয়তো কখনো শোনেন নি। না শুনে থাকলেও আশ্চর্য হবার নেই কিছু। কেননা নামটা যেমন নতুন, রশ্মিটাও তেমনি আনকোরা—মাত্র ক'বছর হল এর ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয়েছে। তবে প্রকৃত শক্তির লেজার রশ্মির কথা আমাদের যে আগামীতে বার বার শুনতে হবে একথা আগে থেকেই বলা যায়।

ধরা যাক আপনি নতুন দামী একটা স্টেরিও রেকর্ড-প্লেয়ার কিনেছেন। এর রেকর্ডের আকার আগেকার রেকর্ডের চেয়ে অনেক ছোট; শব্দ অতি উন্নত মানের। আসলে এতে কোন পিন বা স্টাইলাস নেই। অতি সূক্ষ্ম লেজার রশ্মি এর রেকর্ড থেকে শব্দ সৃষ্টি করছে।

কিংবা ধরা যাক আপনার চোখের অসুখ। পেছনের পরদা 'রেটিনা' বা অক্ষিপটে রক্তক্ষরণ ঘটে আপনার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হতে পারে। লেজার রশ্মি প্রয়োগ করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার চোখের সূক্ষ্ম রক্তনালী বন্ধ করে দিলেন। আপনার চোখ রক্ষা পেল নিশ্চিত অন্ধত্ব থেকে।

১১৭৮ সালের ২৫শে জুন। বিলেতের এক গীর্জায় বসে পাঁচ জন পুরোহিত দেখলেন নতুন চাঁদের এক কোণায় যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। তাঁরা লিখে রেখেছিলেন সে কথা। একালের বিজ্ঞানীরা বললেন, সম্ভবত ঘটনাটা এক বিশাল উল্কাপিণ্ডের আঘাত; আর এই আঘাতেই সৃষ্টি হয়েছে চাঁদের ওপর জিওর্দানো ব্রুনো জ্বালামুখ। এতবড় আঘাত পেয়ে থাকলে এই আটশ' বছর পরও চাঁদ কাঁপছে অতি সামান্য।

ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্য অ্যাপলোর নভোচারীরা চাঁদের ওপর রেখে এলেন ক'টি লেজার প্রতিফলক আয়না। তারপর পৃথিবী থেকে

খুব সম্ভব এর গায়ের রক্ত ঠান্ডা হবার ফলে এটা চলাফেরা করত অতি ধীরে সুস্থে; আর শরীরের বিশাল ওজন বইতে অসুবিধে বলে বেশির ভাগ সময় কাটাত জলা বা নদীর পানিতে। তাই এর খাবারের দরকার হত কম। এর বুদ্ধি-সুদ্ধি যে হাতির চেয়ে কম ছিল তা বোঝা যায়, কেননা শরীর এমন বিশাল হলে কি হবে, এর মগজ ছিল খুব ছোট।

এমনি আরেক বিশাল ডাইনোসর ছিল ব্রন্টোসরাস। কথাটার মানে হল বজ্র-গিরগিটি; এমন বিপুল দেহ নিয়ে এরা যখন হাঁটত তখন বাজ ডাকার মতো মাটি কাঁপত ভেবেই হয়তো এই নাম রাখা হয়েছে। এরাও খেত শুধু ঘাস-পাতা। নাকের ডগা থেকে লেজ পর্যন্ত লম্বায় হত প্রায় বিশ পঁচিশ মিটার, ওজন তিরিশ টন। এমনি তৃণভোজী বিশাল আরেক জাতের নাম হল ডিপ্লোডকাস। অতি লম্বা গলা আর লম্বা লেজ মিলিয়ে এরা হত তিরিশ মিটারের ওপর। কিন্তু এত বড় প্রাণীর মগজটা ছিল একেবারেই মুরগির ডিমের মতো ছোট।

গত একশ' বছরের মধ্যে কত বিচিত্র জাতের ডাইনোসরের যে হদিস পাওয়া গিয়েছে তা ভাবলেও রীতিমতো অবাক হতে হয়। এদের কোন কোনটা ছিল আকারে ছোট। কেউ চলত চার পায়ে, কেউ দু'পায়ে। যারা দু'পায়ে ভর দিয়ে চলত তাদের পেছনের পা ছিল বড় আর সামনের পা খুব ছোট; অনেকটা আজকের ক্যাঙ্গারুদের মতো। ডাইনোসরদের সবাই যে তৃণভোজী ছিল তা নয়, কোন কোন জাত ছিল মাংসভোজী। তাদের দাঁত আর নখ ছিল ধারালো—আর ছুটতে পারত জোরে। তারা অন্য ডাইনোসরদেরও কামড়ে-ছিঁড়ে খেত। খুব সম্ভব নাদুস-নুদুস, হেলেদুলে চলা তৃণভোজী ডাইনোসররাই এদের হাতে মারা পড়ত বেশি।

ধরা যাক টিরানোসরাসদের কথা। 'টিরানো' কথাটার অর্থ হল অত্যাচারী। আর সত্যি 'অত্যাচারী গিরগিটি'ই বটে। দু'পায়ে দাঁড়ানো এই দৈত্যটা উঁচুতে ছিল ছ' মিটারের ওপরে, ওজন প্রায় ছ'টন। মাথার খুলি ছিল দু'মিটার লম্বা—আর চোয়ালে বসানো ঘাটটি ছোরার মতো ধারালো দাঁত; তার এক একটি লম্বায় প্রায় পনের সেন্টিমিটার। এত বড় মাংসখেকো প্রাণী পৃথিবীতে আর কখনো জন্মায় নি। এমনি আরেক দানব মাংসখেকো ছিল অ্যালোসরাস।

এসব হিংস্র মাংসভুক ডাইনোসরদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য কোন কোন জাতের তৃণভোজী ডাইনোসরদের গায়ে থাকত শক্ত বর্ম।

যেমন স্টেগোসরাসদের পিঠে থাকত শক্ত পালের মতো হাড়ের সারি, আর লেজে থাকত লম্বা লম্বা হাড়ের কাঁটা। ট্রাইসেরাটপ নামে ডাইনোসরদের মাথা ঢাকা থাকত মোটা হাড়ের টোপর দিয়ে—তার ওপর আবার ছিল ধারালো দুই শিং।

মাংসখেকো ডাইনোসররা সচরাচর চলত পেছনের দু'পায়ে ভর করে, কখনও ছুটত অতি জোরে। তৃণভোজীরা কেউ চলত চার পায়ে, কেউ দু'পায়ে। কেউবা শক্ত লম্বা পায়ে ছুটত উটপাখির মতো। ছোট ছোট কোন জাত আবার বাদুড়ের মতো চেপটা ডানা মেলে কিছু দূর পর্যন্ত উড়তেও পারত।

আজকাল অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন দু'পায়ে দাঁড়ানো ডাইনোসররা হয়তো আসলে ছিল উষ্ণ রক্তওলা। যেসব শিরদাঁড়াওলা প্রাণীদের রক্ত ঠান্ডা—যেমন সাপ বা গিরগিটি—তারা চলে গড়িয়ে গড়িয়ে বা হেলে-দুলে; এরা কেউ দু'পায়ে দাঁড়াতে পারে না। পাখি আর স্তনপায়ীরা দু'পায়ে দাঁড়ায়; এদের রক্ত উষ্ণ।

আবার কেউ বলছেন, সেকালে সারা পৃথিবীতেই আবহাওয়া ছিল বেশ উষ্ণ; দিন-রাত বা ঋতুভেদে তাপমাত্রার হেরফের কম হত। তার ফলে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকলেও বিশাল ডাইনোসরদের শরীর বেশ গরমই থাকত। ঠিক যেমন বিশাল দীঘির পানি সূর্যের তাপে একবার গরম হলে আর সহজে ঠান্ডা হয়ে যায় না।

হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া

আজ থেকে মোটামুটি সাড়ে ছ'কোটি বছর আগে ডাইনোসররা সব একসাথে ধ্বংস হল কি করে সে এক রহস্য। বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা মত হল এ সময়ে যে কোন কারণেই হোক পৃথিবীর তাপমাত্রা বেশ কমে যায়। তখন ডাইনোসররা এই ঠান্ডা আবহাওয়ার সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে নি। পাখিদের আর স্তনপায়ীদের গায়ে শরীরের তাপ আটকে রাখার জন্য পালক বা লোমের আবরণ আছে। ডাইনোসরদের এ দুয়ের কোনটাই ছিল না—তাই এই দানব প্রাণীরা ঠান্ডায় কাবু হয়ে মারা পড়ে।

আবার কেউ বলছেন, আজ থেকে সাত-আট কোটি বছর আগে দুনিয়ার ওপর অনেক উঁচু জায়গা নিচু হয়ে যায়; ডাঙ্গা তলিয়ে যায়

শক্তিশালী লেজার রশ্মি ছোঁড়া হল চাঁদে। পৃথিবী আর চাঁদের দূরত্ব প্রায় চার লক্ষ কিলোমিটার। এত দূর থেকে সেই রশ্মি ফিরে আসতে যে সময় লাগল তা থেকে অতি নিখুঁতভাবে মাপা গেল চাঁদের দূরত্ব—এই মাপের সম্ভাব্য ত্রুটি মাত্র দশ সেন্টিমিটার বা চার ইঞ্চি। আর দেখা গেল চাঁদ আজো এদিক-ওদিক দুলছে ঠিকই—এই দোলের বিস্তার হল তিন মিটার আর দোলার সময় তিন বছর।

মাত্র ক'দিন আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিগ্যান ঘোষণা করেছেন তাঁর প্রতিরক্ষার মহাপরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার বড় স্থান জুড়ে আছে লেজাররশ্মি সজ্জিত নভোযান। এই নভোযান থেকে লেজারের মারণরশ্মি ছুঁড়ে দিয়ে নিমেষের মধ্যে ধ্বংস করা যাবে প্রতিপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র, নভোযান বা সামরিক কেন্দ্র।

এ সবই সম্ভব লেজার রশ্মির সাহায্যে। এবং এর আরো অজস্র ব্যবহার আবিষ্কৃত হচ্ছে ক্রমাগত। এ এক আশ্চর্য আলোকরশ্মি। কখনো একে বলা হয় মৃত্যুরশ্মি কেননা কয়েক কিলোমিটার দূরে তীব্র লেজাররশ্মি পড়লে সাথে সাথে পুড়ে ছিদ্র হয়ে যাবে পুরু ইস্পাতের পাত। আবার একে জীবনরশ্মিও বলা যেতে পারে। দক্ষ শল্য চিকিৎসক এই রশ্মির সাহায্যে এমন নিখুঁত ভাবে মারাত্মক ক্যানসারের টিউমার কেটে তুলতে পারেন, যা আগে ছিল কল্পনার অতীত।

লেজার কি ?

লেজার (LASER) কথাটা তৈরি হয়েছে "লাইট অ্যামপ্লিফিকেশন বাই স্টিমুলেটেড এমিশন অব রেডিয়েশন"—এই কথাটার আদ্য অক্ষর নিয়ে। এর অর্থ দাঁড়ায় 'উত্তেজিত বিকিরণের সাহায্যে আলোক বিবর্ধন'। এই বিশেষ ধরনের তীব্র আলো সৃষ্টি করা যায় বিশেষ বিশেষ বস্তুর অণু বা পরমাণুকে বিকিরণের সাহায্যে উত্তেজিত করে। সাধারণ আলোতে থাকে নানা মাপের ঢেউ; লেজার রশ্মিতে থাকে সব একই মাপের তরঙ্গ। শুধু তাই নয়, সাধারণ আলো বিশুদ্ধ এক রঙের অর্থাৎ একই মাপের তরঙ্গ হলেও সে সব তরঙ্গ ছোটে নানা তালে; লেজারের আলোর সব তরঙ্গ চলে এক তালে। সাধারণ আলোকে তুলনা করা যায় ছোট-বড় নানা মাপের মানুষের এলোমেলো পথ চলার সাথে; আর লেজার আলো যেন হুবহু এক মাপের কোন সেনাবাহিনীর সুশৃঙ্খলভাবে সমান তালে মার্চ করে চলা।

এর ফলে লেজার আলোর দেখা দেয় বিশেষ কতকগুলো গুণ। এই আলোর রশ্মি হয় একমুখী, অর্থাৎ এমন ঘনসংবদ্ধ যে, মোটেই না ছড়িয়ে এ রশ্মি অনেক দূরের পথ পাড়ি দিয়ে যেতে পারে। লেজারের উৎসে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবাহ কমিয়ে-বাড়িয়ে এই রশ্মির তীব্রতা কমানো বাড়ানো যায়। আবার এই রশ্মি-সংকেত চালু আর বন্ধ করে টেলিগ্রাফের মোর্স সংকেতের মতো এর সাহায্যে বার্তা পাঠানো ও সম্ভব।

লেজার রশ্মি চারপাশে না ছড়িয়ে বহুদূর চলতে পারে বলে একে অতি সূক্ষ্ম কিরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এক মিলিমিটারের হাজার ভাগের এক ভাগকে বলা হয় এক মাইক্রন। আমাদের মাথার একটা চুল চওড়া হয় মোটামুটি একশ' মাইক্রন। অথচ লেজার রশ্মির কিরণ সৃষ্টি করা যায় মাত্র কয়েক মাইক্রন চওড়া। আর এতে এমন শক্তি সঞ্চার করা সম্ভব যে, লক্ষ্যস্থলে সূর্যের ওপরকার তাপের (৬০০০° সেঃ) চেয়েও বেশি উষ্ণতা সৃষ্টি হয়।

তাত্ত্বিক বিবেচনা থেকে লেজার রশ্মির সম্ভাবনার কথা প্রথম প্রকাশ করেন আইনস্টাইন ১৯১৭ সালে। তিনি বলেছিলেন, কোন পদার্থের পরমাণুতে ইলেকট্রনদের উত্তেজিত করলে তা থেকে নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তারপর বহুদিন একে বাস্তব ক্ষেত্রে সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি। অবশেষে বাস্তবক্ষেত্রে লেজার রশ্মি তৈরি করলেন থিওডর মাইম্যান (T. H. Maiman) নামে একজন মার্কিন বিজ্ঞানী ১৯৬০ সালে। তিনি এজন্য ব্যবহার করেছিলেন কৃত্রিম রুবি বা চুনি-পাথরের কেলাস। চুনির লেজার রশ্মি হল টকটকে লাল রঙের; আর বেরোয় ছোট ছোট ঝলকের আকারে।

এরপর চুনিপাথর ছাড়া আরো নানা বস্তু থেকে লেজার রশ্মি সৃষ্টির পদ্ধতি জানা গিয়েছে। নানা রকম গ্যাস থেকেও পাওয়া গিয়েছে লেজার। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আরগন, ক্রিপটন এবং কারবন ডাই-অকসাইড গ্যাস। উৎসের ওপর নির্ভর করে লেজার রশ্মির গুণাগুণ—কত হবে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, কেমন হবে তীব্রতা, ছড়িয়ে পড়বে কতখানি, ঝলকে ঝলকে বেরোবে, না বেরোবে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে। বিভিন্ন ধরনের লেজার ব্যবহৃত হয় নানা রকম কাজে।

প্রথম প্রথম লেজার যখন শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার করা শুরু হল তখন একে ব্যবহার করতে যে কি পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, সে

সম্পর্কে কারো তেমন জানা ছিল না। তাই দুর্ঘটনা ঘটল বেশ-কিছু। যেমন এক কিলোওয়াট শক্তির লেজার আনায়াসে একটি ইস্পাতের বল বিয়ারিংকে বাষ্পে পরিণত করতে পারে। কোন শ্রমিকের হাতে এই লেজারের রশ্মি পড়লে দেখতে দেখতে সে হাত হয়ে যাবে এফোঁড়-ওফোঁড়।

আজকাল মোটর নির্মাণ শিল্পে লেজার রশ্মির সাহায্যে উত্তপ্ত করে ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ তাপ-প্রক্রিয়াজাত করা হচ্ছে। এক সেকেণ্ডের কয়েক হাজার ভাগের এক ভাগের মধ্যে লেজার রশ্মির প্রভাবে যন্ত্রাংশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে প্রায় ১২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তারপর ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে আসে সে অংশ আর তাতে সৃষ্টি হয় অভূতপূর্ব দৃঢ়তা।

সংবাদ আদান-প্রদানে লেজারের ব্যাপক ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। দেখা গিয়েছে তামার তারের মধ্য দিয়ে টেলিফোন বার্তা না পাঠিয়ে তা পাঠানো যেতে পারে সরু কাচের তারের মধ্য দিয়ে। প্রথমে শব্দকে বিদ্যুৎ প্রবাহে রূপান্তরিত করে তাকে কম্পিউটারের সাহায্যে পরিণত করা হয় লেজার রশ্মির ঝলকে। তারপর এই ঝলক পাঠানো হয় কাচের তারের ভেতর দিয়ে। প্রান্তে প্রান্তে আবার লেজারের ঝলককে সাংকেতিক কোড থেকে মূল রূপে পরিণত করা হয় বিদ্যুতের প্রবাহে; তা থেকে পাওয়া যায় শব্দ। এভাবে শুধু যে কথাবার্তা পাঠানো যায় তা নয়, পাঠানো চলছে নানা ধরনের তথ্য, এমনকি টেলিভিশনের ছবি।

ইতিমধ্যে নতুন নতুন বিশাল বিমানে ব্যবহৃত হচ্ছে লেজার নিয়ন্ত্রিত দিক-নির্দেশ-যন্ত্র। কম্পিউটারে লেজার চালিত এমন মুদ্রণ ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে, যাতে প্রতি মিনিটে লেখা ফুটে ওঠে প্রায় ২০,০০০ লাইন। দিন দিনই লেজারের এমনি অজস্র ব্যবহার উদ্ভাবিত হচ্ছে।

লেজার কি করে তৈরি হয় ?

আতশী কাচ দিয়ে সূর্যের আলো শুকনো পাতার ওপর ধরলে তীব্র কেন্দ্রীভূত আলোয় সে পাতা দপ করে জ্বলে ওঠে। লেজারের আলো আসলে এমনি কেন্দ্রীভূত আলো; তফাত এই যে, এ আলো শুধু কেন্দ্রীভূত নয়, সমতালেরও। এর প্রতিটি তরঙ্গ একই দৈর্ঘ্যের আর তারা ছোটে যেন সুসজ্জিত সেনাদলের মতো পা মিলিয়ে।

লেজার রশ্মি সৃষ্টির জন্য বস্তুর পরমাণুতে আগে বাইরে থেকে শক্তি সরবরাহ করে তাদের উত্তেজিত করতে হয়। এই উত্তেজনার ফলে

তাদের ইলেকট্রনরা পৌঁছয় উচ্চতর শক্তিস্তরে। এই উচ্চ শক্তিস্তর থেকে তারা আপনা আপনি নেমে আসে শক্তির নিম্নস্তরে; আর তখন বাড়তি শক্তি ছিটকে পড়ে শক্তিগুচ্ছ বা ফোটনের আকারে—তাকেই দেখি আমরা বিকিরণ হিসেবে। লেজারের মধ্যে এমন ব্যবস্থা করা হয় যাতে এসব ফোটন ইচ্ছেমতো চারদিকে ছড়িয়ে না পড়ে আটকা থাকে একটি আধারে, তারপর সেখানে জমা হবার পর ছিটকে বেরোয় তীব্র আলো-কগুচ্ছ হিসেবে।

মাইম্যান প্রথম যে চুনি পাথরের লেজার তৈরী করেছিলেন তাতে তিনি নিয়েছিলেন দশ সে. মি. (চার ইঞ্চি) লম্বা একটা কৃত্রিম চুনির দণ্ড। এই দণ্ডের একপ্রান্ত রুপোর প্রলেপ দিয়ে করা হয়েছিল আংশিক প্রতিফলক, অন্য প্রান্তে ছিল পুরো প্রতিফলক আয়না। এবার এই নলের চারপাশে পেঁচানো হল একটা ফ্ল্যাশ বা ঝলক আলোর কুণ্ডলী। বিদ্যুৎ প্রবাহের সাহায্যে এই ফ্ল্যাশ-আলো জ্বালানো হলে তা উত্তেজিত করে তোলে চুনিপাথরে ক্রোমিয়ামের পরমাণুকে। এই পরমাণু থেকে সৃষ্টি হয় আলোর ফোটন বা শক্তিগুচ্ছ। কিছু ফোটন ছিটকে পড়ে বাইরে। তবে অধিকাংশ ফোটন দু'প্রান্তের মধ্যে সমান্তরাল পথে ছোটাছুটি করতে তাদের সংখ্যা বুঝি পেতে থাকে। অবশেষে সংখ্যা যথেষ্ট বাড়লে আংশিক প্রতিফলক প্রান্তের বাধা ডিঙিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ে বাইরে।

এমনি চুনির দণ্ড থেকে আলোর যে ঝলক বেরোয় তাতে সব তরঙ্গ হয় একই মাপের, আর তারা চলে একই তালে। এজন্য তাদের তীব্রতা হয় সাধারণ আলোর চেয়ে অনেক বেশি।

মাইম্যানের প্রথম চুনি লেজার তৈরি করার পর গত দু'দশকে লেজারের বিরাট অগ্রগতি ঘটেছে। নানা ধরনের লেজার ব্যবহৃত হচ্ছে নানা কাজে। কঠিন লেজার থেকে সাধারণত আলো পাওয়া যায় ঝলকে ঝলকে; গ্যাস-নিঃসৃত লেজার থেকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আলো বেরোয় অবিচ্ছিন্ন ভাবে। কারবন ডাই-অকসাইড গ্যাস লেজার ব্যবহৃত হচ্ছে কাটার নিপুণ যন্ত্র হিসেবে। বেশি শক্তির লেজার কাজে লাগছে বড় বড় শিল্পে ইস্পাত কাটতে বা জোড়া লাগাতে; কম শক্তিরগুলো শল্য-চিকিৎসার কাজে।

চিকিৎসায় লেজার

চোখের বা কানের ভেতর সূক্ষ্ম শল্যচ্ছেদনে আজকাল লেজার ব্যাপকভাবে কাজ দিচ্ছে। বহুমূত্ররোগে চোখের অক্ষিপটের সমস্যা দেখা দেয়।

তখন অতি সূক্ষ্ম লেজার রশ্মি অক্ষিপটের ওপর ফেলে কাছাকাছি অসংখ্য ছোট ছোট পোড় খাওয়ানো হয়। এতে রক্তনালীর সূক্ষ্ম ফাটল জোড়া লেগে যায়; অবাঞ্ছিত রক্তনালী সৃষ্টিও বন্ধ হয়।

চোখের জটিল ছানির চারপাশ দিয়ে অসংখ্য সূক্ষ্ম ছেঁদা করে কাটতেও লেজার ব্যবহৃত হচ্ছে। সাধারণ ছুরি দিয়ে কাটলে কাটা জায়গায় রক্তপাত বন্ধ করার জন্য অন্য ব্যবস্থা নিতে হয়। লেজারের রশ্মি দিয়ে কাটলে যেমন একদিকে কাটা হয় নিখুঁত, তেমনি কাটা জায়গায় ছোট ছোট রক্তনালী পোড় খাবার ফলে সাথে সাথে তাদের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। মস্তিষ্কে এবং মেরুদণ্ডে যে সব টিউমার বা আব আগে শল্যছেদন করা যেত না, লেজারের অতিসূক্ষ্ম রশ্মির সাহায্যে তারও শল্যছেদন আজ সম্ভব হচ্ছে।

রোগ নির্ণয়েও লেজার রশ্মি কাজ দিচ্ছে। এক ধরনের আলোক-সংবেদী রাসায়নিক বস্তু দেহে ইনজেকশন করে দিলে ক্যানসারগ্রস্ত কোষ প্রতিপ্রভ হয়ে ওঠে। ফুসফুসের ক্যানসারে এমনি ইনজেকশন দিয়ে তারপর ফুসফুসের ভেতর একটি সূক্ষ্ম নলের সাহায্যে লেজার রশ্মি প্রয়োগ করা যায়। সাথে সাথে ক্যানসারের এলাকাগুলো দীপ্তিমান হয়ে সাহায্য করে রোগ নির্ণয় করতে।

যোগাযোগের নতুন দিগন্ত

যোগাযোগের ক্ষেত্রে লেজারের প্রয়োগ ইতিমধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে। এজন্য অর্ধ-পরিবাহী ডায়োড লেজার নামে বিশেষ ধরনের লেজার ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ধরনের লেজার আকারে নুনের দানার মতো ছোট। এই লেজারের রশ্মি ছোটে অতি বিশুদ্ধ কাচের তন্তুর ভেতর দিয়ে। আর এ কাচের তার চুলের চেয়ে সরু, ইস্পাতের চেয়ে মজবুত, তামার চেয়ে নমনীয়।

কাচের তন্তুর ভেতর দিয়ে আলোক চলে বিদ্যুৎগতিতে। বাহক তরঙ্গের স্পন্দনসংখ্যা যত বেশি হবে তার মাধ্যমে তত বেশি পরিমাণ তথ্য পাঠানো যেতে পারে। ট্রানজিস্টার-নিয়ন্ত্রিত বিদ্যুৎ প্রবাহের মাধ্যমে যে বার্তা পাঠানো হয় তাতে স্পন্দনসংখ্যা কয়েক লাখের ওপরে যায় না। অথচ সেখানে লেজার রশ্মির স্পন্দনসংখ্যা হতে পারে সেকেন্ডে বহু লক্ষ কোটি। তার ফলে একটি লেজার রশ্মির মাধ্যমে পাঠানো যায় একসঙ্গে অসংখ্য টেলিভিশনের অনুষ্ঠান।

সাধারণত বিদ্যুৎ চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হয় তামার তার। আজ তামা ক্রমেই হয়ে উঠছে দুষ্প্রাপ্য ধাতু; সে তুলনায় কাচের মূল উপাদান সিলিকন অতি সুলভ। কাজেই তামার তারের তুলনায় বিশুদ্ধ কাচের তারের দাম হবে অনেক কম। তাছাড়া তামার তারের মতো কাচের তারের চৌম্বক আবেশ সৃষ্টির ফলে বৈদ্যুতিক উৎপাত ঘটারও সম্ভাবনা নেই। কাজেই লেজার নিয়ন্ত্রিত কাচের তারের যোগাযোগ ব্যবস্থা আগামী দিনে তামার তারের যোগাযোগকে বাতিল করে দেবে বলে মনে হয়। ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ইউরোপের মধ্যে যোগাযোগের জন্য আটলান্টিক মহাসাগরের তলা দিয়ে কাচের তারের সংযোগ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

আজ বিজ্ঞানিরা চিন্তা করছেন শুধু বার্তাবাহক কাচের তার নয়, যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মতো লেজারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সৃষ্টি নিয়ে। হয়তো একদিন সৃষ্টি হবে লেজারের কমপিউটার। লেজারের অতি উচ্চস্পন্দনের তরঙ্গের সাহায্যে বিপুল পরিমাণ তথ্য জমিয়ে রাখা যাবে অতি ছোট এলাকায়, আর যে কোন তথ্য উদ্ধারও করা যাবে বিদ্যুৎগতিতে। বিজ্ঞানীরা বলছেন নতুন লেজার প্রযুক্তির সাহায্যে একটি কাচের তারের মধ্য দিয়ে মাঝারি আকারের দু'শটি বইয়ের সব লেখা অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেয়া যাবে মাত্র এক সেকেন্ডের মধ্যে। লেজার রশ্মির তথ্য ধারণক্ষমতা যে কী বিপুল এ থেকেই তা বোঝা যায়।

আঠারো শতকের শেষে তৈরি হয়েছিল বাষ্পীয় ইঞ্জিন, উনিশ শতকের শেষে এসেছে বিজলি বাতির বাল্ব, বিশ শতকের মাঝামাঝি এসেছে ট্রানজিস্টার। এরা বিরাটভাবে বদলে দিয়েছে সারা দুনিয়ার মানুষের জীবন। আজ তেমনি লেজার রশ্মি বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের দুয়ারে। আগামী কয়েক দশকের মধ্যে এর মাধ্যমে মানুষের জীবনে যে পরিবর্তন আসবে আজ তা পুরোপুরি কল্পনা করাও শক্ত।

তবে আমরা নিশ্চয়ই আশা করব যে, এই বিপুল শক্তিধর বিস্ময়কর রশ্মি প্রয়োগ করা হবে পৃথিবীতে আরো দক্ষ মারণযজ্ঞ বাধাতে নয়, সারা দুনিয়ার মানুষের জীবনে আরো স্বস্তি আরো স্বচ্ছন্দ্য আনতে, জ্ঞান ও সংস্কৃতির আলোকে তাদের জীবনকে আরো আলোকিত করে তোলার লক্ষ্যে।

জুলাই, ১৯৮৩

যন্ত্রগণকরা আসছে !

পৃথিবীতে প্রথম বিজলি বাতির চল হয়েছিল আজ থেকে প্রায় একশ' বছর আগে। তার প্রায় কাছাকাছি সময়ে এল পেট্রল-চালিত অন্তর্দহন ইঞ্জিন। ঘরে ঘরে বিজলির আলো আর দ্রুতগামী যাতায়াত ব্যবস্থা দৈনন্দিন জীবনে নিয়ে এল বৈপ্লবিক রূপান্তর।

তারপর এল আরো আশ্চর্য সব আবিষ্কার। বিশ শতকের শুরুতে উদ্ভব ঘটল বেতারের সাহায্যে যোগাযোগ, অন্তর্দহন ইঞ্জিন সম্ভব করল আকাশের বুকে পাখির মতো ওড়া। তারপর এই পৃথিবী যেন আর আগের পৃথিবী রইল না। বিদ্যুতের প্রবাহ আলাদীনের প্রদীপের মতো জন্ম দিতে লাগল আশ্চর্যের পর আশ্চর্য।

এই শতকের মাঝামাঝি দেখা দিল বিদ্যুৎ প্রবাহেরই এক বিস্ময়কর অবদান—কম্পিউটার বা যন্ত্রগণক। গত তিন-চার দশকের মধ্যে যন্ত্রগণক যে শুধু উন্নত দেশে বড় বড় শিল্পকারখানা, দূর পাল্লার বিমান, মহাকাশযান, আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী, টেলিযোগাযোগ আর যুদ্ধায়োজনের নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়েছে তা নয়, দৈনন্দিন জীবনের অজস্র ক্ষেত্রে তার সহস্র বাহু বিস্তার করে দিয়েছে।

আমাদের দেশেও আবির্ভাব ঘটতে শুরু করছে যন্ত্রগণক আর তার সঙ্গে প্রাণবন্ত মাইক্রোচিপদের। যেসব ডিজিটাল ঘড়ি আর ছোট ক্যালকুলেটর আজ শোভা পাচ্ছে অসংখ্য লোকের হাতে বা পকেটে তার সবই চলছে মাইক্রোচিপের সাহায্যে। মাইক্রোচিপ কথাটা মিল খায় পটেটো চিপের সঙ্গে। চিপ কথাটার অর্থ চিলতে; তবে এতে চিলতে আলুর নয়, সিলিকন নামে সুলভ একটি মৌল উপাদানের (বালুর দানা যার এক রূপ) আর এর আকার পটেটো চিপের চেয়ে অনেক ছোট।

অথচ এই ছোট্ট চিপই চালাচ্ছে ক্যালকুলেটর, ডিজিটাল ঘড়ি, ভি. সি., আর, কম্পিউটার প্রভৃতি অসংখ্য অবাক-করা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি।

আমাদের দেশে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বড়-ছোট মিলিয়ে যন্ত্রগণক এসেছে মাত্র শ'খানেক; কিন্তু ১৯৮২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হয়েছে প্রায় ত্রিশ লাখ যন্ত্রগণক—তার দাম পড়েছে প্রায় ৫০০ কোটি ডলার। জাপান আর পশ্চিম ইউরোপেও লাখ লাখ যন্ত্রগণক লোকের ঘরে ঘরে আসন করে নিতে আরম্ভ করেছে। আজ মোটর গাড়ি বা টেলিভিশন যেমন উন্নত দেশে প্রায় প্রত্যেক পরিবারে স্থান পেয়েছে, মনে হচ্ছে এই শতকের শেষে তেমনি ঘটবে যন্ত্রগণকের বেলা।

বাংলাদেশেও আজ সরকারীভাবে যন্ত্রগণকের ব্যবহার উৎসাহিত করা হচ্ছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে হয়তো সর্বত্র টেলিফোনের মতোই বিস্তার ঘটতে শুরু করবে যন্ত্রগণকের। ইতিমধ্যে ঘড়ি, ক্যালকুলেটর ছাড়া মাইক্রোচিপ-নিয়ন্ত্রিত দৈনন্দিন ব্যবহারের আরো বহু যন্ত্রপাতি এদেশে আসতে আরম্ভ করেছে।

যন্ত্রগণক আসলে কি ?

কিন্তু কি এই যন্ত্রগণক? কী তার কাজ?—কী যে কাজ নয় তাই বুঝিয়ে বলা শক্ত। কেননা তার নানা রূপ, অজস্র তার ব্যবহার। ট্রানজিস্টার রেডিওর মতো ছোট ছোট যে সব ক্যালকুলেটর আজ ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে ঘরে তাতে সংখ্যা দিয়ে নানা হিসেব করা হয়। কিন্তু প্রতি পদে হিসেবের ধাপগুলো নির্দেশ করতে হয় ব্যবহারকারীকে। যন্ত্রগণককে অসংখ্য হিসেবের প্রোগ্রাম বা কর্মসূচি একযোগে আগে থেকে শিখিয়ে দেয়া যায়, আর সে হিসেবরাশির ফলাফল গণক উগরে দিতে পারে মুহূর্তের মধ্যে।

তাহলে দেখা গেল প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করলে যন্ত্রগণক বিদ্যুৎ-প্রবাহের সাহায্যে সংখ্যাঘটিত নানা জটিল সমস্যার সমাধান করে দেয়। তার এই সংখ্যা মীমাংসার বেগ আশ্চর্যরকম দ্রুত। প্রতি সেকেন্ডে হাজার হাজার হিসেব হতে থাকে এর ভেতরকার জটিল বিদ্যুৎবর্তনীর অন্তরালে। একটা অতি ছোট যন্ত্রগণকও প্রতি সেকেন্ডে করে দেয় কয়েকশ' গাণিতিক হিসেব, আধুনিক বড় যন্ত্রগণক করতে পারে সেকেন্ডে কয়েক কোটি।

যন্ত্রগণক শুধু যে তথ্য সরবরাহ করলে তা দিয়ে অজস্র হিসেব কষে যেতে পারে তা নয়, সে সব তথ্যকে শ্রেণীবদ্ধ করে তার স্মৃতিকোঠায়

জমিয়ে রাখতে পারে--তারপর দরকারমতো যে কোন তথ্য মুহূর্তের মধ্যে পুনরুদ্ধারও করে দিতে পারে। অল্প সময়ে আর স্বল্প পরিসরে বিপুল পরিমাণ তথ্য জমা রাখা যায় বলে অনেক যন্ত্রগণককে ব্যবহার করা হয় 'তথ্য ব্যাঙ্ক' হিসেবে। প্রয়োজনমতো এই ব্যাঙ্ক থেকে তথ্য উদ্ধার করা যায়, অপ্রয়োজনীয় তথ্য মুছে ফেলা যায়, আবার যে কোন নতুন তথ্য যোগ করা যায় অতি সহজে। বিপুল তথ্য জমা রাখার ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে কোন কোন ধরনের যন্ত্রগণক ব্যবহার করা যায় এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় ভাষান্তরের জন্য; কিংবা নানা তথ্যের বিশ্লেষণ অথবা সংশ্লেষণের কাজে।

যন্ত্রগণকের সাহায্যে কোন পরীক্ষণের অথবা ব্যবহারিক সমস্যার হুবহু অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি করা যায়, একে বলা হয় 'সিমুলেশন' বা ঘটনাকল্প। ঘটনাকল্প ঘটতে পারে স্বাভাবিক ঘটনার মতো অথবা তার চেয়ে দ্রুত কিংবা ধীরগতিতে।

যন্ত্রগণক শুধু যে কোন ঘটনার ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তা নয়, সে তার নিজের কাজকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে—বলা বাহুল্য নিয়ন্ত্রণের নিয়ম তাকে শিখিয়ে দিতে হয়। ধরা যাক একটি রাসায়নিক কারখানার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উপকরনের সরবরাহ, তাপমাত্রা, চাপ ইত্যাদি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। এসব নিয়ম সম্পর্কিত সমীকরণ শিখিয়ে দিলে যন্ত্রগণক আপনা আপনি নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারে। এভাবেই সম্ভব হয় বিশাল বিমান বা আন্তমহাদেশ ক্ষেপণাস্ত্র, বিদ্যুৎকেন্দ্র অথবা নভোযানের স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ।

অর্থাৎ এই আশ্চর্য গণকযন্ত্রের ব্যবহার আজ শুধু গণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। জীবনের নানা ক্ষেত্রে নানা ধরনের চিন্তামূলক বা নিয়ন্ত্রণমূলক কাজে লাগানো হচ্ছে একে। বিপুল শক্তিধর যন্ত্রগণকের উদ্ভব বলা বাহুল্য রাতারাতি ঘটে নি। এর পেছনে রয়েছে মানুষের দীর্ঘকালের সাধনা।

কেমন করে শুরু হল ?

হিসেবপত্র প্রায়ই আমরা মনে মনে করি, তারপর তার ধাপগুলো কাগজে লিখি। অবশ্য হিসেব করা বা হিসেব রাখার জন্য সহায়ক উপকরণের ব্যবহার নতুন নয়। আদিম যুগের মানুষ রশিতে গেরো দিয়ে হিসেব

রাখত তারিখ বা পরিমাণের (এখনও আমাদের দেশে গ্রামে অনেকে রাখে)। চীনা আর জাপানীরা 'অ্যাবাকাস' নামে ফ্রেমে-আঁটা কটকগুলো সমান্তরাল সুতো বা তারে নানা রঙের ঘুঁটি চালিয়ে দ্রুত সব ধরনের হিসেব কষতে পারে, এর উদ্ভব আজ থেকে অন্তত তিন-চার হাজার বছর আগে।

ষোড়শ শতকে ইউরোপে গিয়ারের সাহায্যে নানা ধরনের ঘড়ি এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈরির চেষ্টা চলতে থাকে। ১৬৪২ সালে ব্লেইজ প্যাসকাল নামে এক ফরাসী বিজ্ঞানী প্রথম গিয়ারযুক্ত গণনযন্ত্র তৈরি করেন। এর সাহায্যে কেবল যোগ আর বিয়োগ করে যেত। গুণ করতে হলে বারবার যোগ করতে হত। ১৬৭১ সালে জার্মান বিজ্ঞানী লাইবনিৎস এমন গণনযন্ত্র তৈরি করলেন যা গুণও করতে পারে।

উনিশ শতকে চেষ্টা শুরু হল কি করে হিসেবের প্রত্যেকটা ধাপ আলাদা আলাদা না করে একটা পূর্ব-নির্দিষ্ট কর্মসূচির সাহায্যে যন্ত্রকে দিয়ে আপনা আপনি করানো যায়। চার্লস ব্যাবেজ নামে এক ইংরেজ গণিতবিদ এমন এক যন্ত্র তৈরির জন্য বহু নকশা তৈরি করলেন—যন্ত্রকে হিসেবের কর্মসূচি দেবার জন্য পাঞ্চ-কার্ড নির্দিষ্টভাবে সাজানো অনেকগুলো ফুটোযুক্ত কার্ড) ব্যবহারের প্রস্তাব তিনিই প্রথম করেন। এমনি পাঞ্চ-কার্ডের সাহায্যে নানা ধরনের তথ্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি বের করলেন মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার হারমান হোলারিথ। ১৮৯০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আদমশুমারির তথ্য বিশ্লেষণ করার জন্য হোলারিথের পাঞ্চ-কার্ড যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

প্রথম আধুনিক যন্ত্রগণক তৈরি হয় ১৯৪৬ সালে। পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা প্রায় ১৮,০০০ ভ্যাকুয়াম টিউব ব্যবহার করে তৈরি করলেন প্রথম কমপিউটার বা ইলেকট্রনিক যন্ত্রগণক। তার আকার দাঁড়াল একটি বড়সড় রকম ঘরের সমান—ওজন প্রায় ত্রিশ টন। খরচ পড়ল প্রায় পাঁচ লাখ ডলার। এর নাম দেয়া হল 'ইলেকট্রনিক নিউমারিকাল ইনটিগ্রেটর অ্যান্ড অটোম্যাটিক ক্যালকুলেটর' বা সংক্ষেপে ENIAC। কিন্তু এতগুলো ভাল্‌ভ্ ব্যবহার করার ফলে যন্ত্রটা গরম হয়ে উঠত তাড়াতাড়ি। গড়পড়তা প্রতি সাত মিনিটে জ্বলে যেত একটি ভাল্‌ভ্, আর তার ফলে অনবরতই ভাল্‌ভ্ বদলাতে হত। 'এনিয়াক' দশমিক পদ্ধতিতে হিসেব করে সেকেন্ডে প্রায় ৫,০০০ যোগ-বিয়োগ করতে পারত। তবে তার জন্য এই বিশাল দানব বিদ্যুৎ গিলত ১৪০,০০০ ওয়াট। ১৯৪৯ সালে এনিয়াকের একটি

উন্নততর সংস্করণ ব্যবহৃত হল মার্কিন সেন্সাস ব্যুরোর আদমশুমারির তথ্য বিশ্লেষণের কাজে।

ইতিমধ্যে ১৯৪৮ সালে উদ্ভাবিত হল ট্রানজিস্টার (নামটা ট্রান্সফার রেজিস্টার থেকে সংক্ষেপ করে তৈরি)। ভাল্‌ভ্‌ দিয়ে যেমন বিদ্যুৎ প্রবাহের গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়, অল্প বিদ্যুৎ প্রবাহের ওঠা-নামা বাড়িয়ে তোলা যায় বহুগুণে, তেমনি সম্ভব ট্রানজিস্টার দিয়ে। তবে ট্রানজিস্টারের আকার হল ভাল্‌ভের চেয়ে অনেক ছোট; এতে বিদ্যুৎ খরচও অনেক কম, তাই তাপ সৃষ্টির সমস্যা নেই। তার ফলে অনেক ট্রানজিস্টার কাছাকাছি বসানো সম্ভব হল। সৃষ্টি হল আরো ছোট, আরো উন্নত দ্বিতীয় প্রজন্মের যন্ত্রগণক।

এদিকে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, অসংখ্য ট্রানজিস্টার তারের সাহায্যে জোড়া দেবার মোটেই দরকার নেই। সংযোগের কাজ চলতে পারে একটি বোর্ডের ওপর ছাপা সূক্ষ্ম ধাতব রেখার সাহায্যে। এতে যন্ত্রের আকার আরো ছোট হয়ে এল, সংযোগের দূরত্ব কমার ফলে বাড়ল হিসেবের বেগ।

১৯৫৮ সালে উদ্ভব ঘটল 'ইনটিগ্রেটেড সার্কিট' বা সমন্বিত বিদ্যুৎ-বর্তনীর। এতে বোর্ডের ওপর শুধু অসংখ্য সংযোগ রেখা নয়, তার সঙ্গে ট্রানজিস্টারও খোদাই করে দেয়া হল ছোট সিলিকন পাতের গায়ে। সাধারণ ট্রানজিস্টারে দুটি পজিটিভ চার্জযুক্ত সিলিকন স্তরের (পি-স্তর) মাঝখানে বসানো হয় একটি নিগেটিভ চার্জযুক্ত স্তর (এন-স্তর), অথবা দুটি এন-স্তরের মধ্যে থাকে একটি পি-স্তর। মাঝের স্তরটি ভাল্‌ভের গ্রিডের মতো বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। দেখা গেল সিলিকনের ওপর সরাসরি নির্দিষ্ট পরিমাণ বোরন বা ফসফরাস স্থাপন করে পাশাপাশি পি-স্তর আর এন স্তর তৈরি করা যায়। আর এভাবে একটি ছোট্ট সিলিকন পাতের ওপর সৃষ্টি হয় অসংখ্য ট্রানজিস্টার, ক্যাপাসিটার (ধারক) প্রভৃতি ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ। ডাকটিকিটের মতো ছোট ছোট সিলিকন পাতের ওপর পরতে পরতে ছাপা হতে লাগল জটিল নানা বিদ্যুৎবর্তনী। এমনি ইনটিগ্রেটেড সার্কিট ব্যবহার করে ষাটের দশকের মাঝামাঝি বাজারে বেরলো তৃতীয় প্রজন্মের যন্ত্রগণক—তার মধ্যে বিখ্যাত হল IBM-360। এদের বলা হল মিনি-কমপিউটার বা খুদে যন্ত্রগণক।

ছোট, আরো ছোট

এদিকে চেষ্টা চলতে লাগল আরো ঘন সন্নিবদ্ধ, আরো ছোট ছোট আকারের বর্তনী সৃষ্টির জন্য। ১৯৭১ সালে উদ্ভব ঘটল সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU) বা মাইক্রোপ্রসেসর-এর। চার মিলিমিটার লম্বা, তিন মিলিমিটার চওড়া এক টুকরো ছোট সিলিকন পাতের ওপর বসানো হল প্রায় অদৃশ্য দু'হাজারের ওপর ট্রানজিস্টার এবং অন্যান্য উপকরণ। উদ্ভব ঘটল একটি চিপে বসানো স্বয়ংসম্পূর্ণ মাইক্রো-কমপিউটার বা অতিখুদে যন্ত্রগণক।

এ যে কী পর্যায়ের সূক্ষ্মতা তা কল্পনা করাও শক্ত। মধ্যযুগে পাদ্রীরা তর্ক করত একটা সূচের ডগায় কতগুলো দেবদূতে নাচতে পারে এজাতীয় সব বাহুল্যের বিষয় নিয়ে। এমনি সূক্ষ্মতা এল বিদ্যুৎবর্তনীর ক্ষেত্রে। মানুষের চুল চওড়ায় মোটামুটি একশ' মাইক্রন। মাইক্রোচিপ বা অতি ছোট চিপ এ ট্রানজিস্টারের অংশ কোথাও চওড়া মাত্র তিন মাইক্রন। নানা ধরনের মাইক্রোচিপ তৈরি হতে লাগল: কোনটা শুধু স্মৃতিকেন্দ্র, কোনটা বিবর্ধক, কোনটার বা কর্মসূচিও অন্তর্ভুক্ত হল। আজকাল কোন কোন মাইক্রোচিপে বসানো হচ্ছে দশ লাখের ওপর ট্রানজিস্টার।

মাইক্রোপ্রসেসর চিপে কর্মসূচি-কেন্দ্র বসাবার ফলে এতে দরকার মতো নতুন কর্মসূচি দেয়া সম্ভব হল। এমনি একটি মাইক্রোচিপের ক্ষমতা হয়ে দাঁড়াল বিশাল 'এনিয়াক' এর চেয়েও বেশি। আর তার ফলে সত্তরের দশকের শেষে এল মাইক্রো-কমপিউটার বা অতি খুদে যন্ত্রগণকের যুগ; এবার যন্ত্রগণক শুধু শিল্প কারখানা, হাসপাতাল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠান নয়, টেলিফোন সেটের মতো ঢুকতে লাগল লোকের ঘরে ঘরে।

কমপিউটারের একটি প্রাথমিক এবং আকর্ষণীয় ব্যবহার হয়েছে, নানা ধরনের ভিডিও-খেলায়। বাড়ির টেলিভিশনের সঙ্গে লাগিয়ে দিলে এর সাহায্যে টিভির পর্দায় অসংখ্য ধরনের খেলা চলতে পারে। এখন শুধু বিনোদন নয়, শিক্ষার জন্যও এসব কমপিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রতিটি টেলিফোন সেট যেমন কোন এক্সচেঞ্জের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে এবং তার সাহায্যে নানা জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়, তেমনি কমপিউটারের সংযোগ ঘটানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় তথ্য সংগ্রহের সঙ্গে। ফলে চিকিৎসা, আইন, আবহাওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্য এ ধরনের যে কোন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা যাচ্ছে বাড়িতে বসেই। মোটরগাড়ি

ঘরকন্নায় ব্যবহৃত নানা ধরনের যন্ত্রপাতি; সাধারণ খেলনা ইত্যাদিতেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে মাইক্রোচিপ।

সংখ্যা নিয়ে হিসেব করে যে সব যন্ত্রগণক তাদের একটা সাধারণ নাম হল ডিজিটাল কমপিউটার ('ডিজিট' মানে সংখ্যা)। এসব যন্ত্রগণকে দু'ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হয়। এক হল সংখ্যা, আরেক হল এসব সংখ্যা নিয়ে কি করতে হবে তার নির্দেশ,—বা কর্মসূচি। আর যেহেতু যন্ত্রগণক মানুষের সাধারণ ভাষা বোঝে না কাজেই তাকে এসব দিতে হবে কোড বা সাংকেতিক ভাষায়। এমন সংকেত যা যন্ত্রগণক বুঝতে পারবে আর সেই সংকেতের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে পারবে।

বাইনারি পদ্ধতির হিসেব

প্রথম 'এনিয়াক' যন্ত্রগণকে ব্যবহৃত হয়েছিল আমাদের সাধারণ দশ-ভিত্তিক সংখ্যা, কিন্তু দেখা গেল এতে জটিলতা বেশি। তার চেয়ে অনেক সহজ হল দুই-ভিত্তিক সংখ্যা গণনা পদ্ধতি। যে কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রে 'হ্যাঁ' বা 'না', 'অন' বা 'অফ', বিদ্যুৎ আছে বা নেই, পজিটিভ অথবা নেগেটিভ সংকেত সৃষ্টি করা যায় অতি সহজেই। এই দু'টি সংকেতের সাহায্যে গণনা পদ্ধতি সৃষ্টি করলে তাকে বলা হয় 'বাইনারি' পদ্ধতি। লেখার সময় 'হ্যাঁ'কে লেখা হয় ১ আর 'না'কে লেখা হয় ০। মাত্র এই দু'টি সংকেত দিয়ে সৃষ্টি হতে পারে যে-কোন সংখ্যা।

আসলে দশ-ভিত্তিক গণনা-পদ্ধতিই একমাত্র গণনা-পদ্ধতি নয়। আমাদের সপ্তাহের হিসেব হয় ৭-এর ভিত্তিতে। দিনের ঘন্টা আর বছরের মাসের হিসেব করা হয় ১২-এর ভিত্তিতে। দশ ভিত্তিক হিসেব পদ্ধতিতে ডান পাশের প্রথম রাশিটা বোঝায় একক, তার বাঁ পাশে এক ঘর সরলে হয় দশগুণ; তার পরেরটি হয় আরো দশগুণ ইত্যাদি। দুই ভিত্তিক গণনা পদ্ধতিতে ডান পাশের প্রথম রাশিটি একক; তার বাঁ পাশেরটি হলে ২; তার পরেরটি আরো ২ গুণ অর্থাৎ ৪ ইত্যাদি।

দশমিক পদ্ধতিতে ১০ লিখলে বোঝাবে এককের ঘরে কিছু নেই দশকের ঘরে ১; অর্থাৎ মোট সংখ্যা দশ। বাইনারি পদ্ধতিতে ১০ লিখলে

বোঝাবে এককের ঘরে কিছু নেই, দুই-এর ঘরে ১; অর্থাৎ মোট সংখ্যা দুই। কাজেই দশমিক পদ্ধতিতে আমরা যাকে লিখি ১৪ ($১\times১০^{১}+৪\times১০^{০}$) তাকে বাইনারি পদ্ধতিতে লিখতে হবে ১১১০ ($১\times২^{৩}+১\times২^{২}+১\times২^{১}+০\times২^{০}$)।

বাইনারি পদ্ধতির সুবিধে হল এতে যে-কোন সংখ্যাকে শুধু ১ আর ০ বা 'হ্যা' আর 'না' কিংবা 'পজিটিভ' (অথবা ঘড়ির কাঁটার মতো ডান পাশে চুম্বকন), বা 'নিগেটিভ' (বা ঘড়ির কাঁটার উলটো অর্থাৎ বাঁ পাশে চুম্বকন) দিয়ে প্রকাশ করা যায়।

সাধারণত ডিজিটাল কমপিউটারে 'ইনপুট' আর 'আউটপুট' ছাড়া থাকে তিনটি অংশ (১) হিসেব কেন্দ্র, (২) নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র আর (৩) স্মৃতি কেন্দ্র। এর প্রথম দু'টি মিলে হল CPU বা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ইউনিট—এখানেই সব তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। স্মৃতিকেন্দ্র হিসেবে আজকাল প্রধানত চৌম্বক ক্ষেত্র ব্যবহার করা হয়। তাতে সেকেন্ডে মোটামুটি লাখ দশেক তথ্য জমা রাখা বা ব্যবহার করা চলে।

বড় যন্ত্রগণকের ভেতরে অ্যালুমিনিয়াম চোঙের গায়ে লোহার অক্সাইডের প্রলেপ দেয়া চৌম্বক ড্রাম থাকে। বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে দ্রুত এই ড্রাম ঘোরে, আর তার গায়ে টেপ-রেকর্ডারের মতো সরু ফিলতেতে চুম্বকের সাহায্যে তথ্য রেকর্ড করা যায়। হ্যাঁ বা না-বোধক প্রতিটি চিহ্নকে বলা হয় 'বিট' ('বাইনারি ডিজিট' কথাটার সংক্ষিপ্ত রূপ)। ড্রামের ফিলতেতে প্রতি সেন্টিমিটারে ২০ থেকে ১২০ বিট তথ্য জমা থাকতে পারে। এভাবে একটি ড্রামে এক লাখ বা দু'লাখ বিট জমা রাখা সম্ভব। ড্রাম ঘুরতে যতটা সময় লাগে গড়পড়তা তার অর্ধেক সময়ে যে কোন তথ্য যন্ত্রগণকের স্মৃতিকোষ থেকে উদ্ধার করা যায়।

যন্ত্রগণকে ছোটখাট প্রোগ্রাম বা কর্মসূচি পাঞ্চ-কার্ডের সাহায্যে দেয়া যায়। IBM-এর ৩¼″×৭⅜″ আকারের কার্ডে থাকে ৮০টি করে খাড়া কলাম, প্রতিটি কলামে ১২টি করে পাঞ্চ বা ফুটো করার জায়গা। যে জায়গায় ফুটো করা হয় সেটা বোঝায় ১, যেখানে ফুটো নেই সেটা ০। বর্ণমালার অক্ষরগুলো এবং বিভিন্ন সংখ্যা ১ আর ০ এই দুই সংকেতের সমাবেশে ফুটো হিসেবে পাঞ্চ করা হয়। এসব কার্ড দ্রুত-গতিতে যন্ত্রের ভেতর দিয়ে চালিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবাহী ব্রাশ বুলিয়ে মিনিটে শ'দুই কার্ডের তথ্য পড়া যায়, আলোক-রশ্মি বিশ্লেষকের সাহায্যে পড়া যায় মিনিটে হাজার দুই।

অবশ্য আজকাল যন্ত্রগণকের তথ্য পাঞ্চ-কার্ডের মাধ্যমে না দিয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেয়া হয় চৌম্বক টেপের মাধ্যমে। এই টেপ সাধারণ টেপরেকর্ডার বা ক্যাসেট রেকর্ডারের টেপের মতোই। প্লাস্টিকের পাতলা ফিতের ওপর থাকে লোহার আকসাইডের প্রলেপ। আধ ইঞ্চি চওড়া টেপে সাধারণত সাত বা আটটি সমান্তরাল চিলতেতে তথ্য সংকেত রেকর্ড করা হয়। টেপ লম্বা হতে পারে ২০ মিটার থেকে ১০০০ মিটার। প্রতি সেন্টিমিটার চিলতেতে তথ্য থাকে প্রায় একশ' থেকে পাঁচশ'। হাজার মিটার একটি টেপে জমা থাকতে পারে প্রায় দু'কোটি বিট তথ্য, যে কোন তথ্য মুছে ফেলে সেখানে আবার অন্য তথ্য রেকর্ড করা যায়। প্রতি সেকেন্ডে পাঁচ হাজার থেকে আড়াই লাখ তথ্য এক টেপ থেকে অন্য টেপে বদলি করা যায়।

আজকাল টেপের বদলে গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো চাকতির আকারের চৌম্বক রেকর্ডও তথ্য জমা রাখার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব রেকর্ডের ব্যাস সাধারণত ৩০ সেন্টিমিটার থেকে ১৫০ সেন্টিমিটার; প্রতি রেকর্ডে থাকতে পারে ২০০ থেকে ৩৫০টি ট্রাক। প্রতি মিনিটে এমনি চাকতি বা ডিস্ক রেকর্ড ঘোরে ১৫০০ বার। একশ' সে. মি. ডিস্কে এক কোটি বিট তথ্য জমা থাকতে পারে। খুদে কমপিউটারে আজকাল ১০-১৫ সে. মি. চওড়া ডিস্ক ব্যবহার করা হচ্ছে, এতে এক লাখ থেকে এক কোটি বিট তথ্য থাকতে পারে।

সংকেত থেকে প্রতীক

যন্ত্রগণকে শুধু ০ আর ১ দিয়ে তৈরি পৃথক পৃথক সংকেত ঘোগালে হবে না, সে সংকেতগুলো দিয়ে সংখ্যা বা অক্ষর বা প্রতীক তৈরি করতে হবে। ধরা যাক একটি যন্ত্রগণকে আটটি সংকেত দিয়ে একটি করে অক্ষর বা আর কোন প্রতীক তৈরির ব্যবস্থা রাখা হল অথবা ব্যবস্থা থাকল সেগুলি সংকেতের প্রতীক তৈরির। এমনি যে ক'টি সংকেত-গুচ্ছ মিলে প্রতীক তৈরির ব্যবস্থা থাকে তাকে বলা হয় বাইট byte। অতি ছোট আকারের যন্ত্রগণকে এমনি বাইট থাকে ছোট—৪, ৮, ১২ বা ১৬ বিট সমাবেশের। বড় যন্ত্রগণকের সামর্থ্য বেশি; তাতে বাইট হতে পারে বড়সড়—৩২, ৪৮ বা ৬৪টি সংকেতের।

একটি যন্ত্রগণকের স্মৃতিকেন্দ্রে কতগুলো করে বাইট, অর্থাৎ অক্ষর বা প্রতীক জমা থাকবে তাও যন্ত্রের আকার ও সামর্থ্যের ওপর নির্ভর

করে। এই সংখ্যাকে নির্দেশ করা হয় কিলোবাইট বা হাজার বাইট দিয়ে। যদি বলা হয় একটি যন্ত্রগণকের ক্ষমতা ১ কিলোবাইট তাহলে তার স্মৃতিকেন্দ্রের ভাণ্ড $২^{১০}$ বা ১,০২৪ বাইট; যদি হয় ১৬ কিলো-বাইট তাহলে বুঝতে হবে তার স্মৃতিকেন্দ্রে জমা থাকতে পারে ১৬×২^{১০} বা ১৬,৩৮৪ বাইট। ছোটখাট যন্ত্রগণকের স্মৃতিকেন্দ্রের ক্ষমতা স্বভাবতই কম। খুব কম দামের (একশ ডলারের নিচে) টাইমেক্স-সিনক্লেয়ার যন্ত্রগণকের স্মৃতিশক্তি হল ২ কিলোবাইট অর্থাৎ ২,০৪৮ বাইট।

যন্ত্রগণকের ক্ষমতার প্রকাশ আসলে তার স্মৃতিকেন্দ্রে কি পরিমাণ তথ্য জমা রাখা যায় আর কতগুলো করে হিসেব প্রতি সেকেন্ডে করা সম্ভব—এই দুটো মিলিয়ে। একেবারে প্রথম দিকে ভাল্‌ভচালিত যন্ত্রগণকে হিসেব করা যেত সেকেন্ডে মাত্র গোটা দশেক। পঞ্চাশের দশকের শেষে ট্রানজিস্টার চালিত যে সব দ্বিতীয় প্রজন্মের যন্ত্রগণক বেরলো তার বেগ ছিল সেকেন্ডে প্রায় দশ হাজার হিসেব। ষাটের দশকে তৃতীয় প্রজন্মের যে সব যন্ত্রগণক বেরিয়েছে তার হিসেবের বেগ সেকেন্ডে কয়েক কোটি। আজকাল একটা মাঝারি ধরনের খুদে যন্ত্রগণকের কার্যবেগও সেকেন্ডে লাখখানেক—অর্থাৎ এনিয়াক এর চেয়ে বিশগুণ বেশি।

ইতিমধ্যে দেখা গিয়েছে এনিয়াকের পর থেকে প্রতি আট বছরে যন্ত্রগণকের তথ্য জমা রাখার ক্ষমতা দশগুন করে বেড়ে যাচ্ছে। এখন এমন মাইক্রোচিপ উদ্ভাবিত হয়েছে যার এক একটির স্মৃতিশক্তি ২৫৬ কিলোবাইট। অর্থাৎ ঘটরদানার মতো ছোট একটি সিলিকন পাতে জমা থাকতে পারে আড়াই লাখের ওপর অক্ষর, সংখ্যা বা প্রতীক। বাজারে চালু অধিকাংশ মাইক্রোচিপ অবশ্য এখনো ১৬, ৩২ আর ৬৪ কিলোবাইটের। তথ্য প্রক্রিয়াকরণের বেগও বেড়েছে তেমনি। এনিয়াক থেকে শুরু করে এযাবৎ প্রতি ছ'বছরে যন্ত্রগণকের হিসেবের বেগ হয়েছে দ্বিগুণ।

যন্ত্রগণকের ভাষা

যন্ত্রগণকে ১ আর ০ দিয়ে তৈরী সংকেতের সাহায্যে সব ধরণের নির্দেশ তৈরির জন্য উনিশ শতকের ব্রিটিশ গণিতবিদ জর্জ বুল এর তৈরি বুলীয় বীজগণিতের নিয়মকানুন ব্যবহার করা হয়। বীজ-গণিতে সব সংখ্যার শুধু দুটো রূপ—সত্যি আর মিথ্যে। সত্যি (১) বোঝবার জন্য প্রয়োগ করা হয় নির্দিষ্ট বিদ্যুৎচাপ, মিথ্যে (০)

বোঝাতে ব্যবহার করা হয় শূন্য বা আর কোন নির্দিষ্ট বিদ্যুৎচাপ। তিনটে মাত্র ক্রিয়ার সাহায্যে এই বীজগণিতের সব নির্দেশ প্রয়োগ করা যায়—যোগ বোঝাতে ব্যবহৃত হয় OR, গুণ বোঝাতে AND আর বিয়োগ বোঝাতে NOT। এই তিনটি ক্রিয়া বা যুক্তির সমাহারে সাজানো বেড়াজাল ডিঙিয়েই যন্ত্রগণক সব সমস্যার সমাধানে পৌঁছয়।

যন্ত্রগণক মানুষের ভাষা বোঝে না, তাই তার জন্য নানা সংকেত আর প্রতীকের সাহায্যে তৈরি করতে হয়েছে নানা ধরনের যন্ত্রভাষা। সবচেয়ে প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে BASIC (বিগিনার্স অল-পারপাস সিমবলিক ইন্সট্রাকশন কোড), FORTRAN ফরমুলা ট্রান্সলেশন), COBOL (কমন বিজনেস ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ), ALGOL (অ্যালগরিদমিক ল্যাঙ্গুয়েজ)। নাম থেকেই বোঝা যায় BASIC হল সাধারণ ভাষার খুব কাছাকাছি- ছোটখাট যন্ত্রগণকে আজকাল এর ব্যাপক ব্যবহার। COBOL ব্যবহৃত হয় ব্যবসা-বাণিজ্যে, FORTRAN বৈজ্ঞানিক গবেষণাও বিশ্লেষণে, ALGOL উচ্চ গণিতে। এসব ভাষার সাহায্যে তৈরী হয় নানা ধরনের কাজের বা সমস্যা সমাধানের জন্য নানা 'প্রোগ্রাম' বা কর্মসূচি।

যন্ত্রগণক জীবনের সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ার ফলে আমাদের ভাষাতেও ক্রমে ক্রমে নতুন শব্দের আবির্ভাব ঘটেছে—যেমন হার্ডওয়্যার (যন্ত্রপাতি) ও সফ্‌টওয়্যার যন্ত্রগণকের নানা ধরনের কর্মসূচী, ROM রীড ওনলি মেমোরি' অর্থাৎ যে স্মৃতিকেন্দ্র থেকে শুধু তথ্য উদ্ধার করা যায় কিন্তু ব্যবহারকারী তাতে নতুন কোন তথ্য ঢোকাতে পারে না) ও RAM ('র‍্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি' অর্থাৎ যে স্মৃতি কেন্দ্রে দরকার মতো বিভিন্ন তথ্য বা নির্দেশ সম্বলিত কর্মসূচী জমা করা যায় এবং প্রয়োজন মতো তা উদ্ধার করা যায়), বিট ও বাইট, CPU (সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট), VDU (ভিজুয়্যাল ডিসপ্লে ইউনিট —টেলিভিশনের মতো পরদা যাতে নানা রকম সংকেত বা ছবি ফুটে ওঠার ব্যবস্থা থাকে) ইত্যাদি।

আগামী দিনে যন্ত্রগণক

যন্ত্রগণক সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল অন্য সব পণ্যসামগ্রীর বেলা নতুন মডেল বেরোলে ক্রমাগত দাম বাড়তে থাকে, এর বেলায় ঘটছে তার উলটো। প্রথম যন্ত্রগণক এনিয়াক তৈরি করতে খরচ পড়েছিল প্রায় পাঁচ লাখ ডলার। আজ এর সমান ক্ষমতাসম্পন্ন অথচ অনেক ছোট

আকারের যন্ত্রগণকের দাম দু'তিনশ ডলারের বেশি নয়। নতুন নতুন উন্নত মাইক্রোচিপ উদ্ভাবনের ফলে যন্ত্রের আকার কমছে দ্রুতগতিতে। ১৯৫৯ সালে প্রথম যে চিপ বাজারে বেরোয় তাতে ট্রানজিস্টার থাকত মাত্র একটি, ১৯৬৫ সালে প্রতি চিপে যন্ত্রাংশ বেড়ে হল দশটি; ১৯৭০ সালে হাজারটি, ১৯৮০ সালে লাখ লাখে। চিপের আকার কমার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ কমেছে, ছোট আকারের যন্ত্র অনায়াসে সর্বত্র বয়ে নেয়াও চলছে। একদিকে স্মৃতিকেন্দ্রের ধারণক্ষমতা আর যন্ত্রগণকের হিসেবের বেগ যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে তার নির্ভরযোগ্যতা; ব্যবহার প্রণালীও আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়ে এসেছে। একই যন্ত্রগণক ভিন্ন ভিন্ন প্রোগ্রাম জুড়ে দিয়ে লাগানো যাচ্ছে অসংখ্য ধরনের কাজে।

সুলভ, আশ্চর্য ক্ষমতাধর, সর্বগামী যন্ত্রগণকের ব্যাপক প্রয়োগের ফলে ইতিমধ্যে উন্নত দেশগুলোতে মানুষের জীবনের ওপর বিরাট রকম প্রভাব পড়তে আরম্ভ করেছে। এই প্রভাব ক্রমে ক্রমে আমাদের দেশেও এসে পড়ছে। উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষা বিস্তারে, স্বাস্থ্য সুবিধে সম্প্রসারণে এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন দুনিয়াজোড়া মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়ছে আজ প্রতি বছর ১২·৫ শতাংশ হারে। এই বিপুল পরিমাণ জ্ঞান সংরক্ষণ, শ্রেণীবিন্যাস করা এবং প্রয়োজনমতো উদ্ধার করার জন্য যন্ত্রগণক ব্যাপকভাবে কাজে আসছে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ের কাজ করে দিচ্ছে যন্ত্রগণক। ব্যাঙ্কের লেনদেন, গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ, শিল্পক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যন্ত্র পরিচালনা—সবই সহজ হয়ে এসেছে যন্ত্রগণকের কল্যাণে।

পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে আজ সরাসরি উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত রয়েছে মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৩৫ থেকে ৫০ ভাগ। মনে হচ্ছে যন্ত্রগণকের বরোলতে শীগগিরই এই হার নেমে আসবে দশ শতাংশে। এর ফলে বাড়তি শ্রমশক্তি কি বেকার হয়ে পড়বে? অপরিকল্পিত অর্থনীতিতে তেমন হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। অবশ্য কম শ্রমে অধিক উৎপাদন সম্ভব হলে সেবামূলক নানা পেশার পরিধি বিস্তৃত হবে। উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে তাকে অনেকে ইউরোপের শিল্প-বিপ্লবের মতোই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন।

ঘরে ঘরে যন্ত্রগণকের সমাবেশ এবং উপগ্রহের মাধ্যমে তথ্য বিস্তারের মণিকাঞ্চনযোগে দুনিয়াজোড়া তথ্যের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ঘটছে এক

বিরাট বিপ্লব। এর ফলে বিশ্বে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিপুল বিস্তারের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আশংকা জাগছে হয়তো এর মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলো আরো বেশি করে কুক্ষিগত হয়ে পড়বে আন্তর্জাতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত তথ্যব্যবস্থায়, সংকুচিত হবে তাদের তথ্য সংগ্রহ বা সম্প্রচারের স্বাধীনতা, উৎসাহিত হবে সে সব দেশে পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতির বিস্তার।

যেমন মাইক্রোচিপের উন্নতি ঘটছে তেমনি ক্রমেই উন্নত, আরো উন্নত ধরনের যন্ত্রগণক তৈরি হচ্ছে। ইতিমধ্যে পঞ্চম প্রজন্মের যন্ত্রগণক তৈরির আয়োজন চলছে। তাতে শুধু একটি বড় স্মৃতিকেন্দ্র আর একটি নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র থাকবে না, থাকবে সমান্তরালভাবে জোড়া অনেকগুলো স্মৃতিকেন্দ্র। আর অনেকগুলো নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র। তার ফলে যন্ত্রগণকের ক্ষমতা বাড়বে আরো, তার কার্যপদ্ধতি হয়ে উঠবে মানুষের মস্তিষ্কের আরো কাছাকাছি।

যন্ত্রগণকের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে শুধু যে তা জটিল যন্ত্রপাতি চালাচ্ছে তা নয়, মানুষের চিন্তার কাজ অনেকটাই করতে আরম্ভ করেছে যন্ত্র। এর ফলে মানুষ কি ক্রমে ক্রমে যন্ত্রের দাস হয়ে পড়বে? এ প্রশ্ন ইতিমধ্যে অনেককে ভাবিয়ে তুলেছে। আসলে যন্ত্রগণক যত উন্নতই হোক তা মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষমতাকে কখনো অতিক্রম করতে পারবে বলে মনে হয় না। যন্ত্র তো শুধু স্মৃতি আর যুক্তির সমাহার; মানুষের মতো সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনা, কল্পনা আর আবেগ কি তার কাছে আশা করা যায়?

মানুষের মনন, অনুভূতি, কুশলতা আর সৃজনশীলতার উপমা সম্ভবত মানুষ কেবল নিজেই। যন্ত্রগণক যত বিপুল শক্তিধর, অলৌকিক স্মৃতিময় আর ক্ষিপ্র-সংবেদী হোক সে তবু শুধু যন্ত্রই। এই যন্ত্রকে কাজে লাগানো যেতে পারে সমগ্র পৃথিবীকে ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য; অথবা নিখুঁত লক্ষ্যভেদী ক্ষেপণাস্ত্র এবং অন্যান্য আধুনিক মারণযন্ত্রের সাহায্যে দেশে দেশে কালো মৃত্যুর বিভীষিকা ছড়িয়ে দিতে। এই নতুন প্রযুক্তিকৌশল আয়ত্ত না করে এ সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার করা যে কোন দেশের পক্ষেই রীতিমতো শক্ত হবে।

জুন ১৯৮৩

ভূমিকম্প কি ঠেকানো যাবে?

প্রকৃতির ভয়ংকর শক্তি ভূমিকম্পে সময় যেমন করাল রূপ নিয়ে দেখা দেয় এমন বুঝি আর কোন কিছুতেই নয়। অকস্মাৎ পৃথিবী কাঁপতে থাকে টালমাটাল, মাটির তলা থেকে প্রচণ্ড গর্জন করে ফুঁসে ওঠে বিশাল ফাটল। রাস্তাঘাট উপড়ে যায়, বাড়িঘর ভেঙে পড়ে তাসের ঘরের মতো। শহরাঞ্চলে গ্যাস আর বিজলির লাইন ছিঁড়ে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। দেখতে দেখতে বিশাল শহর পরিণত হয় বীভৎস ধ্বংসস্তূপে।

১৯২৩ সালে টোকিওতে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে শহরটির বিরাট অংশ ধ্বংস হয়, মারা যায় অন্তত দেড় লাখ লোক। ১৯৭০ সালে পেরুতে এক ভূমিকম্পে মৃত্যু ঘটে সত্তর হাজার লোকের, আশ্রয়হীন হয় প্রায় আট লাখ। ১৯৭৬ সালে চীনের তাংশান অঞ্চলে এক বিশাল ভূমিকম্প কেড়ে নেয় প্রায় আট লাখ লোকের জীবন। তার দু'বছর পর উত্তর-পূর্ব ইরানে ভূমিকম্পে মারা যায় পঁচিশ হাজার লোক।

এসব ভূমিকম্প সবই ছিল রিখটার মাপে ৮ পয়েন্ট বা তার কাছাকাছি। এই মাপে সবচেয়ে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হল ১২ পয়েন্ট। ১ পয়েন্টের ধাক্কা যন্ত্র দিয়ে বোঝা যায়, কিন্তু মানুষ টের পায় না। ৩ পয়েন্ট ধাক্কায় ঝুলন্ত বাতি দুলতে থাকে, দরজা বাড়ি খায়। ৭ পয়েন্টের ভূমিকম্পে বাতি জোরে দোলে, আসবাবপত্র হেলে পড়ে বাড়িঘরের যথেষ্ট ক্ষতি হয়, মাটিতে ফাটল দেখা দেয়। এর চেয়ে জোরালো ভূমিকম্পে ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ে; ভূমিধ্বস হয়, রাস্তাঘাট গুঁড়িয়ে যায়, কোথাও নদীর পথ যায় বেঁকে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন প্রতি বছর পৃথিবীতে ছোট-বড় মিলিয়ে ভূমিকম্প হয় লাখ দশেক। অবশ্য এর মধ্যে বেশির ভাগই টের পায় না। মোটামুটি বড় ভূমিকম্প (অর্থাৎ রিখটার মাপে ৬·৫ পয়েন্ট বা তার বেশি) হয় শ'খানেক। তার মধ্যে সত্যিকার বড় ভূমিকম্প

হয় গোটা কুড়ি। এসব ভূমিকম্পে প্রতি বছর মানুষ মারা যায় বহু হাজার—কখনো লাখের ওপরে। বাড়িঘর যে কত ধ্বংস হয় তার হিসাব করাও শক্ত।

মানুষের বহু হাজার বছরের ইতিহাসে এমনি ভূমিকম্প এসেছে অসংখ্য বার। মাঝে মাঝেই পৃথিবীর মাটি টলে উঠেছে, ভূত্বকে দেখা দিয়েছে তোলপাড়, শহর-বন্দর-গ্রাম ধূলিসাৎ হয়েছে। কখনো তার সাথে ফুঁসে উঠেছে সাগরের বিশাল ঢেউ, কখনো বা গর্জে উঠেছে সুপ্ত আগ্নেয়গিরির লাভা প্রবাহ।

কেন ভূমিকম্প ?

ভূমিকম্প কেন হয় তা নিয়ে ভেবেছে মানুষ সেই প্রাচীনকাল থেকে। প্রাচীনকালে ভারতে একদল লোক ভাবত পৃথিবীটা বসানো আছে বাসুকী নামে এক সাপের ফণার ওপর, আর এই ফণা নড়াচড়া করলেই পৃথিবীতে দেখা দেয় তোলপাড়। আবার কেউ ভাবত পৃথিবী রয়েছে বিশাল এক কাছিমের পিঠে। জাপানীরা ভাবত পৃথিবী রয়েছে প্রকাণ্ড এক মাকড়সার ওপর, সেই মাকড়সা হেলে-দুলে চলার সময় তার নড়াচড়াতে হয় ভূমিকম্প। অবশ্য বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে এসব কাল্পনিক গল্প মানুষ ছেড়েছে বহু আগেই।

এককালে বিজ্ঞানীরা ভাবতেন উত্তপ্ত পৃথিবী ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে আসার ফলে তার ওপরকার ভূত্বক সংকুচিত হয়ে আসছে, আর এতে ভূত্বকের ওপর যে টান পড়ছে তাতেই সৃষ্টি হচ্ছে ভূমিকম্প। কিন্তু ভূমিকম্পের আসল কারণ মানুষ বুঝতে শুরু করেছে খুব সাম্প্রতিককালে। আজ দেখা যাচ্ছে ভূমিকম্পের কারণ রয়েছে আসলে পৃথিবীর গভীর নিম্নস্তরে। আর সেজন্যই পৃথিবীর ভেতরকার খবর না জেনে ভূমিকম্পের কারণ বোঝা শক্ত।

কিন্তু পৃথিবীর গভীর তলার খবর শুধু জানতে চাইলেই তো আর সহজে জানা যায় না। পৃথিবীর ভেতরে তাপমাত্রা ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে, আর কঠিন শিলা খুঁড়ে মাটির নিচে নামাও দুঃসাধ্য। আধুনিক বিজ্ঞানের এত অগ্রগতি সত্ত্বেও মানুষ মাটির তলায় গর্ত খুঁড়তে পেরেছে মাত্র এগার কিলোমিটারের মতো গভীর। পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত যে দূরত্ব তার তুলনায় এ গভীরতা একেবারেই নগণ্য। তবু নানা নতুন নতুন সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভূমিকম্প সম্বন্ধে

তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে মানুষ। আর এসব গবেষণা থেকে শুধু যে ভূমিকম্পের খবরই জানা যাচ্ছে তা নয়, পাওয়া যাচ্ছে মাটির তলার তেল, গ্যাস, কয়লা প্রভৃতি খনির খবর। আর সবচেয়ে বড় কথা, এসব গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেবার উপায়, আর এই পূর্বাভাসের সাহায্যে বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষের জীবন।

আজকের দিনে বড় বড় জনপদে বহু লক্ষ মানুষ বাস করে অল্প কয়েক বর্গ কিলোমিটার এলাকায়। রাসায়নিক কারখানায় ব্যবহৃত হয় বিপজ্জনক সব রাসায়নিক উপাদান। শহরের আশেপাশে জমা থাকে দাহ্য জ্বালানির বিরাট রকম সঞ্চয়। বিশাল বাঁধ আটকে রাখে বিপুল পরিমাণ পানি। এ সবই ভূমিকম্পের ক্ষতিকে করে তোলে আগেকার দিনের তুলনায় অনেক বেশি ভয়াবহ। তাই আগে থেকে ভূমিকম্পের সঠিক পূর্বাভাস জানতে পারা আজ হয়ে উঠেছে এমন জরুরী। আর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে দালান-কোঠা নির্মাণে ভূমিকম্প প্রতিরোধক উন্নত ডিজাইন।

পূর্বাভাসের পদ্ধতি

ষাটের দশক থেকে ভূবিদ্যায় ঘটেছে বিপুল অগ্রগতি। তার ফলে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেবার পদ্ধতি ক্রমেই শিখুঁত হয়ে উঠেছে সঠিক পূর্বাভাস দেবার জন্য জানতে হবে কোথায় দেখা দেবে ভূমিকম্প, কেমন হবে তার তীব্রতা, ঠিক কখন আসবে তার আঘাত। এসব যদি কয়েক বছর আগে জানা যায় তাহলে সেখানে বাড়িঘর সেভাবে সাবধানতা নিয়ে তৈরি করা যায়। কবে বা কখন ভূমিকম্প হবে সেটা সুনির্দিষ্টভাবে জানা গেল, লোকজনকে আগে থেকে অপসারণ করে, বিজলি আর গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে বহু লোকের জীবন রক্ষা করা সম্ভব।

কিন্তু সঠিক পূর্বাভাস দেবার সমস্যা কম নয়। সেজন্য জানতে হবে ভূত্বকের ভেতর কি ঘটছে তার কথা। অথচ আগেই বলা হয়েছে, ভূত্বকের ভেতর বেশি দূর পর্যন্ত যাবার উপায় নেই, যা কিছু উপাত্ত সবই যোগাড় করতে হবে পরোক্ষভাবে। ভূত্বকের ভেতর সব সময়ই চলছে নানা ধরনের টানাপোড়েন—চাপ, টান, নমন কাজ করছে নানা দিক থেকে। তাছাড়া ভূগর্ভের নানা স্তরের শিলা মোটেই সুষম বা সমসত্ত্ব নয়, নানা স্তরে নানা বস্তুর ঘনত্বে রয়েছে ঢের তফাত—

তেমনি তফাত তাদের প্রকৃতিতে আর শক্তি সঞ্চয়ে। এসব কারণে ভূগর্ভের গাণিতিক মডেল নির্মাণ রীতিমতো দুরূহ।

কিন্তু তবু এদিকে বহুদূরে এগিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ভূকম্প-প্রবণ এলাকার শিলা বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করে ভূকম্পের পূর্বাভাস দেবার নানা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্ভাব্য ভূমিকম্পের খবর পাবার জন্য প্রায় তিনশ' রকম বিভিন্ন লক্ষণ তাঁরা সনাক্ত করেছেন। আর শিলার কম্পন এবং অন্যান্য লক্ষণ থেকে এমন কি কয়েক বছর আগে থেকেই বলা সম্ভব কোন এলাকায় ভূমিকম্প আসন্ন হয়ে উঠছে কিনা। রিখটার মাপকাঠিতে পাঁচ পয়েন্টের ভূমিকম্পের পূর্বাভাস আজ দেয়া যাচ্ছে কয়েক মাস আগে, ছ'পয়েন্টের কয়েক বছর আগে, সাত পয়েন্টের বছর দশেক আগে, আর আট পয়েন্টের কয়েক দশক আগে থেকে। ছ' পয়েন্টের ভূমিকম্পের কেন্দ্র হয় প্রায় বিশ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে, আর তার কাঁপুনির এলাকা হতে পারে এক লাখ বর্গ কিলো মিটার। এর চেয়ে বড় ভূমিকম্পের এলাকা হবে আরো বড়। কাজেই সঠিক পূর্বাভাসের জন্য বিশাল এলাকা জুড়ে চালাতে হবে জরিপ।

এটা আজ জানা গিয়াছে যে, অধিকাংশ ভূমিকম্পের উৎপত্তি মাটির তলায় দশ থেকে বিশ কিলোমিটার নিচে। কাজেই পৃথিবীর ওপর ভূকম্পের তরঙ্গ মাপতে হলে জরিপ কেন্দ্রগুলো দশ থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে দূরে হওয়া দরকার; কিন্তু এত কাছাকাছি ভূ-কম্পকেন্দ্র বসানো কোন দেশের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। আসলে বাস্তব ক্ষেত্রে একশ' কিলোমিটারের কম দূরত্বে এসব কেন্দ্রে স্থাপন সম্ভব হয় না। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন তাদের ভূকম্প-প্রবণ এলাকাগুলোতে এমনি শত শত জরিপকেন্দ্র স্থাপন করেছে। এধরনের কেন্দ্র বসাবার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও।

পৃথিবীর গড়নের সাথে ভূমিকম্পের উৎপত্তির সম্পর্ক বোঝা গিয়েছে এ শতকের গোড়া থেকেই। দেখা গিয়েছে কোথাও ভূকম্প ঘটলে শিলার ভেতর দিয়ে দু'ধরনের স্পন্দন ছড়িয়ে পড়ে। একটা হল শিলার আগু-পিছু সংকোচন-প্রসারণ—এর বেগ মোটামুটি সেকেন্ডে আট কিলোমিটার। আরেকটা হল ওপর-নিচে নমনের ঢেউ—এর চারপাশে ছড়িয়ে পড়ার বেগ মোটামুটি সেকেন্ডে পাঁচ কিলো-মিটার। দূরের কোন ভূকম্প-পরিমাপ কেন্দ্রে প্রথম ধরনের ঢেউ আগে পৌঁছয় বলে একে বলা হয় মুখ্য (প্রাইমারি) বা পি-তরঙ্গ,

আর দ্বিতীয় ধরনের ঢেউকে বলা হল গৌণ (সেকেন্ডারি) বা এস-তরঙ্গ। এই দু'ধরনের তরঙ্গ পৌঁছবার সময়ের তারতম্য থেকে ভূকম্পউৎস কতদূরে তা হিসেব করার একটা উপায় পাওয়া গেল। দু' তিনটে ভূকম্প-জরিপ-কেন্দ্রে এই হিসেব পেলে তার সাহায্যে নির্দিষ্টভাবে ভূকম্প উৎসের অবস্থান জানাও সম্ভব হল।

ভূমিকম্পের নতুন তত্ত্ব

১৯০৯ সালে আন্দ্রিয়া মোহোরোভিচ নামে সার্বিয়ার একজন ভূবিজ্ঞানী প্রথম লক্ষ্য করেন যে, ভূকম্পের ঢেউ যেন মাটির ৩০-৪০ কিলোমিটার নিচে একটি স্তরে প্রতিফলিত হয়ে ফেরত আসছে। তাঁর নাম অনুসারে এই স্তরের নাম দেওয়া হল 'মোহ' স্তর; বোঝা গেল এই স্তরের নিচে শিলার প্রকৃতি বদলে যাচ্ছে। এই স্তরের ওপরকার শিলাকে বলা হল ভূত্বক; আর এর নিচের স্তরকে বলা হল 'ম্যান্টল্' বা ভূগর্ভ-আবরণ।

আসলে আজ বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর ভেতরকার গড়নকে মোটা-মুটি একটা গোলগাল ডিমের সাথে তুলনা করেন। ডিমের ভেতরকার কুসুমটা অতি উত্তপ্ত ভূগর্ভস্তর; কুসুমের ওপরকার সাদা অংশ হল উত্তপ্ত ম্যান্টল্ বা ভূগর্ভ আবরণ—এই স্তরের শিলা তাপে নমনীয় রূপ নিয়েছে।

আগে বিজ্ঞানীরা যে ভাবতেন পৃথিবীর ওপরকার স্তর ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডায় কুঁচকে যাবার ফলে ভূমিকম্প সৃষ্টি হয় সে তত্ত্ব আজ বাতিল হয়েছে। আজকের বিজ্ঞানীরা বলছেন, আসলে পৃথিবীর ভূত্বক ডিমের খোসার মতো আস্ত অবিচ্ছিন্ন নয়; তাতে রয়েছে ডজনখানেক পৃথক খণ্ড। আর এই খণ্ডগুলো পরস্পরের সাথে গায়ে গায়ে লেগে স্থির হয়ে নেই—ক্রমাগত তাদের পরস্পরের মধ্যে নড়াচড়া চলছে, কোথাও তারা দূরে সরে যাচ্ছে পরস্পর থেকে। এই তত্ত্বের নাম দেয়া হয়েছে ভূপৃষ্ঠের 'প্লেট টেক্টনিক্স' বা পাত-সংগঠন তত্ত্ব।

প্রায় একশ' কিলোমিটার উঁচু ভূত্বকের পাত প্রতিবছর কয়েক সেন্টিমিটার করে দূরে সরে যাচ্ছে—এ তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের অনেকের পক্ষেই প্রথম প্রথম মেনে নেয়া শক্ত হয়েছিল। কিন্তু তারপর আট-লান্টিক মহাসাগর এবং আরো অনেক সাগরের তলায় পরীক্ষা করে দেখা গেল সেখানে শিলার বয়স সর্বত্র এক নয়। যেখানে ভূত্বকের দু'টি পাতের জোড় থাকার কথা সেখানে শিলার বয়স অনেক কম।

অর্থাৎ এই জোড়ের ফাঁকে ভূগর্ভ থেকে অনবরত ম্যাগমা বা গলন্ত শিলা ভেসে উঠে সৃষ্টি করেছে নতুন শিলাস্তর আর তার ধাক্কায় দু'পাশে সরে যাচ্ছে ভূত্বকের পাত। আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকা বিশ কোটি বছর আগে ছিল পরস্পরের গায়ে জোড়া; তারা ক্রমে ক্রমে সরতে সরতে আজকের অবস্থায় দাঁড়িয়েছে।

কখনো ভূত্বকের একটি পাত সরতে সরতে ঠেলে উঠে পড়ে অন্য পাতের ওপর বা ঢুকে যায় তার নিচের। এমনি ঘটেছিল পাঁচ কোটি বছর আগে—ভারতীয় প্লেট উত্তর দিকে ধাক্কা খায় এশীয় প্লেটের সাথে, আর তাতেই সৃষ্টি হয় হিমালয় পর্বতমালা। দু'টি প্লেটের মধ্যে সংঘর্ষে যদি বেশি উত্তাপের সৃষ্টি হয় তাহলে দেখা দেয় আগ্নেয়গিরি।

ভূত্বকের পাত-সংগঠনের তত্ত্ব থেকে ভূমিকম্পের ব্যাখ্যা দেয়া হয়ে গেল সহজ। দু'টি পাতের মধ্যে পরস্পর ধাক্কা বা ঘষা থেকে সৃষ্টি হয় শিলাস্তরে পীড়ন। পীড়নের ফলে কখনো জমে উঠতে থাকে চাপ। অনেক সময় ভূগর্ভের আলোড়নের মধ্য দিয়ে ঘটে এই চাপের মুক্তি। আর তাই দেখা দেয় ভূমিকম্প হিসেবে। বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেটের এক প্রান্ত রয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে—উত্তর আমেরিকা প্লেটের গায়ে লাগানো; অন্য প্রান্ত আছে জাপানের পাশ দিয়ে এশিয়ার উপকূল বেয়ে। এই প্লেটটি ক্রমে ক্রমে সরে যাচ্ছে উত্তর-পশ্চিম দিকে। আর তার ফলে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে বিশাল এক ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা।

সোভিয়েত ও চীনা বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন যে, ভূমিকম্পের আগে কুয়ার পানিতে রেডন গ্যাসের পরিমাণে বেশ ওঠা নামা হয়। সব শিলাতেই কিছু না কিছু ইউরেনিয়াম বা রেডিয়াম থাকে; তাদের বিকিরণজনিত ক্ষয় থেকে তেজস্ক্রিয় রেডন গ্যাসের উদ্ভব হয়। ভূত্বকের নিচে দু'টি শিলাস্তরের আপেক্ষিক স্থানচ্যুতি ঘটলে যে ফাটল দেখা দেয় তার ফলে অসংখ্য সূক্ষ্ম ফুটোর মুখ খুলে যায়—আর শিলা থেকে এক সাথে মুক্তি পায় অনেক রেডন গ্যাস। তাই ভূমিকম্পের আগে রেডনের পরিমাণ বেশ বেড়ে যায়; তারপর আবার কমে প্রায় স্বাভাবিক হয়ে আসে। এ থেকে চীনা বিজ্ঞানীরা সারা দেশ জুড়ে অসংখ্য কুয়ার পানিতে রেডনের পরিমাণ মাপার জন্য স্বেচ্ছাসেবী তরুণ কর্মীদের নিয়োগ করেছেন এবং তার ফলে অনেক জায়গায় ভূমিকম্পের আগে সঠিক পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হচ্ছে। ১৯৭৫ সালে এক ভূমিকম্পে চীনের হাইচেং শহর ধ্বংস হয়; কিন্তু সঠিক

পূর্বাভাস দেবার ফলে শহরের অধিবাসীদের আগেই সতর্ক করা হয়েছিল এবং সেজন্য আদৌ কোন প্রাণহানি ঘটে নি।

পূর্বাভাসের নতুন পদ্ধতি

চীনা বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেবার জন্য জীবজন্তুর অদ্ভুত আচরণের ওপর খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন। তাঁরা বলছেন ভূমিকম্পের আগে পাখিরা সব অকস্মাৎ উড়ে চলে যায়; মাছেরা নদী থেকে উধাও হয়। কুকুর করুন সুরে ডাকতে থাকে। ব্যাঙ ডোবা থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ে; হরিণ বন থেকে বেরিয়ে আসে বাইরে। এছাড়া আকাশে দেখা দেয় অদ্ভুত আলো, বিচিত্র মেঘ; কুয়ার পানিতে পাওয়া যায় অস্বাভাবিক গন্ধ; অবশ্য এসব লক্ষণ যে সবই খুব নির্ভরযোগ্য অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরা এখনো সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি। ১৯৭৬ সালে চীনের তাংশানে বিরাট ভূমিকম্প হয়ে কয়েক লাখ লোক মারা পড়ে; চীনা বিজ্ঞানীরা এর কোন আগাম পূর্বাভাস দিতে পারেন নি।

চীনা বিজ্ঞানীরা কিছু কিছু ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দান মার্কিন এবং অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীদের রীতিমতো বিস্মিত করেছে। সাধারণত আগে ধারণা করা হত ভূগর্ভে কোথাও স্তরবিচ্যুতি ঘটলে তার কাছাকাছি ভূমিকম্প দেখা দেবে। কিন্তু চীনা বিজ্ঞানীরা স্তর-বিচ্যুতির এলাকা থেকে অনেক দূরের ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছেন। আজ বিজ্ঞানীরা দেখছেন আসলে কোন কোন স্তরবিচ্যুতি ভূগর্ভে ক্রমে ক্রমে বিশাল এলাকা জুড়ে এগিয়ে যায়—এই এগিয়ে যাবার বেগ বছরে মাত্র শ'খানেক কিলোমিটার। এসব স্তর-বিচ্যুতি ভূপৃষ্ঠের ৩০-৫০ কিলোমিটার নিচ দিয়ে সৃষ্টি করে এক ভূ-তরঙ্গ; আর এই তরঙ্গ যদি কোথাও আঘাত করে ভূ-গর্ভের কোন পুরানো ফাটলের এলাকাকে তাহলে সেখানে দেখা দেয়, ভূমিকম্প।

ভূগর্ভের নানা শিলাস্তর এবং তাতে নানা ধরনের পীড়ন ও চাপের উৎপত্তি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ক্রমেই বাড়ছে এবং তার ফলে ভূমিকম্পের উদ্ভব সম্বন্ধে আজ আমাদের কিছুটা স্পষ্ট ধারণা জন্মেছে। আর ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে ধারণার স্বচ্ছতার সাথে সাথে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেবার উন্নত পদ্ধতিও উদ্ভাসিত হচ্ছে। মাত্র গত ষাটের দশক থেকে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেবার পদ্ধতি চালু হলেও ইতিমধ্যে চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান, মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য ভূমিকম্প পূর্বাভাসের ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে।

১৮-১৯ শতকের জার্মান মনীষী গ্যেটে বলেছিলেন, 'আর যাই হোক ভূমিকম্পের সাথে লড়াই চলে না।' গ্যেটের সময়ে মানুষ ভূমিকম্প সম্বন্ধে জানত অতি সামান্যই। সেকালের মানুষের পক্ষে ভূমিকম্পের সাথে লড়াই তো দূরের কথা, কবে কোথায় ভূমিকম্প দেখা দেবে তা অনুমান করাও ছিল অসম্ভব।

কিন্তু আজ সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। আজ বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর ভূকম্পপ্রবণ এলাকাগুলো চিহ্নিত করেছেন; অসংখ্য ভূকম্প জরিপ কেন্দ্রে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে অতি মৃদু ভূকম্পের পরিমাপ করা হচ্ছে দিনরাত; অগুনতি তথ্যের কম্পিউটার বিশ্লেষণের সহায়ে ভূগর্ভে যেসব অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে তাদের চিহ্নিত করা হচ্ছে আর এসবের ফলে সম্ভব হচ্ছে কোথায় কখন ভূমিকম্প হতে পারে, কেমন হতে পারে তার তীব্রতা সে সম্পর্কে পূর্বাভাস দেয়া। এমনি পূর্বাভাসের ফলে সম্ভব হচ্ছে জনসাধারণের পক্ষে সতর্ক হওয়া; দালান-কোঠা থেকে সময়মতো বেরিয়ে আসার ফলে ভূমিকম্পে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কমে এসেছে। ভূকম্পপ্রবণ এলাকায় আধুনিক নির্মাণকৌশলের প্রয়োগে দালান-কোঠা তৈরি হচ্ছে মজবুত করে যাতে ভূমিকম্প তাদের ক্ষতি করতে না পারে।

মানুষ কি কোন দিন ভূমিকম্প ঠেকাতে পারবে?—তাও হয়তো পারবে একদিন। ভূগর্ভের শিলাস্তরের ফাটলের এলাকায় প্রচুর তরল পদার্থ ঢেলে দিয়ে বিজ্ঞানীরা ছোটখাট কৃত্রিম ভূকম্প সৃষ্টি করেছেন; পরমাণু-বোমা বা অন্য বিস্ফোরণ ঘটিয়েও সৃষ্টি করা যাচ্ছে এমনি ছোটখাট ভূকম্প। এ ধরনের ছোট আকারের পরিকল্পিত ভূকম্পের সাহায্যে ভূগর্ভের চাপ মুক্তি দিয়ে হয়তো ঠেকানো যাবে বড় আকারের ভূমিকম্প।

সবচেয়ে বড় কথা: ভূমিকম্পের ভীতিপ্রদ আকস্মিকতা আজ অন্তর্হিত। তার ভয়ংকর ধ্বংসক্ষমতা স্তিমিত। সম্ভবত এমন দিন বেশি দূরে নয় যেদিন আমরা বলতে পারব ভূমিকম্প মানুষের কাছে পরাভূত।

জুলাই ১৯৮৩

রহস্যময় বারমুদা ট্র্যাঙ্গেল

আটলান্টিক মহাসাগরে এমন একটি জায়গা আছে যেখানে বহুকাল ধরে নানা রহস্যময় ঘটনা ঘটছে। এই এলাকা দিয়ে যাবার সময় জাহাজ প্রায়ই বিপদে পড়ে—কখনো অকস্মাৎ তলিয়ে যায় গভীর সাগরের তলায়; তারপর তার আর কোন হদিস খুঁজে পাওয়া যায় না। কখনো এখান দিয়ে যাবার সময় বিপদে পড়ে উড়োজাহাজ। কেন যে এত বেশি সংখ্যক জাহাজ আর বিমান এই এলাকাটিতে এমন বিপদে পড়েছে তার কোন হদিস খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই প্রায় বলা হয়ে থাকে বারমুদা ট্র্যাঙ্গেল হল এক রহস্যজনক ভয়ের এলাকা কিন্তু সত্যি কি তাই?

জায়গাটি হল বারমুদা দ্বীপের কাছে—বারমুদা, ফ্লোরিডা আর পোর্টোরিকো এই তিনটি জায়গাকে তিন কোণা ধরে একটি ত্রিভুজ তৈরি করলে যে এলাকা হবে, তারই নাম দেওয়া হয়েছে 'বারমুদা ট্র্যাঙ্গেল'। কখনো একে বলা হয় 'শয়তানের ত্রিভুজ', কখনো 'মৃত্যু-ত্রিভুজ'। সমুদ্র এখানে চার পাঁচ কিলোমিটার গভীর। আর যখন এখানে কোন জাহাজ ডুবে যায় তারপর তার কোন চিহ্নই নাকি খুঁজে পাওয়া যায় না।

রহস্যের সূত্র

রহস্যটির সূত্রপাত ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরই—১৯৪৫ সালের শেষে। ৫ ডিসেম্বর তারিখে বিকেল ২টা ১০ মিনিটে ফ্লোরিডার ফোর্ট লডারডেল বিমান ঘাঁটি থেকে উড়েছিল পাঁচটি বোমারু বিমান—বিমানগুলো চালাচ্ছিল চৌদ্দজন অভিজ্ঞ পাইলট। আবহাওয়া ছিল বেশ পরিষ্কার। কিন্তু খানিক পরেই ঘাঁটিতে বেতারের খবর এল: স্কোয়াড্রনের নেতা চার্লস টেলর বলছেন, 'আমরা বড় বিপদে পড়েছি। পথ হারিয়ে ফেলেছি। কোথাও স্থল দেখা যাচ্ছে না।'

ঘাঁটি থেকে বলা হল ঃ 'তোমরা কোথায় আছ জানাও।'

বিমান থেকে খবর গেল ঃ 'আমরা কোথায় তা বলতে পারছি না। কোন্ দিকে যাচ্ছি তাও বুঝতে পারছি না। সমুদ্রের এ জায়গা একেবারেই অচেনা ঠেকছে।'

চোদ্দ জন অভিজ্ঞ পাইলট মিলে এমন চমৎকার আবহাওয়ায় পথ হারিয়ে ফেলবে এটা ঘাঁটির সবার কাছে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হল। তারপর মনে হল বিমানের বৈমানিকরা আর ঘাঁটির কোন বেতার বার্তা শুনতে পাচ্ছে না কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে যে সব কথা বলছে তা ঘাঁটিতে শোনা যেতে লাগল ঠিকই। মনে হল তাদের সবগুলো কম্পাসই গিয়েছে বিগড়ে; বিমান চালাবার যন্ত্রপাতিগুলোর কাঁটা নড়াচড়া করছে একেবারে এলোমেলোভাবে। এমনকি বৈমানিকরা কোন অজ্ঞাত কারণে সূর্যও দেখতে পাচ্ছে না।

শেষমেষ একটা অস্পষ্ট কথা ভেসে এল ঃ 'আমরা নেমে যাচ্ছি সাদা পানির দিকে......আমরা ডুবে যাচ্ছি'। সঙ্গে সঙ্গে ১৩ জন ক্রুসহ একটি উদ্ধার বিমান পাঠানো হল কিন্তু এরও কোন হদিস পাওয়া গেল না।

এরপর শ'তিনেক বিমান আর কয়েক ডজন জাহাজ নিয়ে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ হল। বারমুডা থেকে মেক্সিকো উপসাগর পর্যন্ত পুরো এলাকা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। কিন্তু ছ'টি বিমান তলিয়ে যাবার কোন চিহ্ন কোথাও পাওয়া গেল না।

গত তিন-চার দশকে শ'দেড়েক জাহাজ আর গোটা পনের উড়োজাহাজ ডুবেছে এই এলাকায়। ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ মালবাহী জাহাজ 'মিলটন' আর ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে 'অ্যানিটা' নামে নরওয়েজীয় জাহাজ অদৃশ্য হয়ে যায় এখানে।

আসলে প্রায় পাঁচ শতাব্দী আগে যখন থেকে স্পেনীয় আর পর্তুগিজ নাবিকরা এই অঞ্চলে জাহাজ চালাতে শুরু করে তখন থেকেই এখানে এমনি রহস্যজনকভাবে জাহাজ তলিয়ে যাবার খবর পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য সেকালের লোকে ভাবত এসব জলদস্যুদের কীর্তি বা সামুদ্রিক ঝড়ের ফল। কিন্তু তারপর দেখা গেল এধরনের দুর্ঘটনার পর কোন ধ্বংসাবশেষ বা মৃতদেহ কাছাকাছি কোথাও তীরে ভিড়ে ঠেকার কোন খবর পাওয়া যায় না।

নানা রকম বিচিত্র বর্ণনা পাওয়া যেতে লাগল এসব ঘটনার। জাহাজের যন্ত্রপাতি হঠাৎ বিগড়ে যায়, আকাশ হয়ে ওঠে হলুদ রঙের

পরিষ্কার আবহাওয়ায় হঠাৎ দেখা দেয় ঘন কুয়াশা, সমুদ্র দেখায় অদ্ভুত। কেউ কেউ বললেন সেখানে হাওয়ার মধ্যে আছে কোন অদৃশ্য গর্ত—তার মধ্যেই অকস্মাৎ হারিয়ে যায় জাহাজ আর বিমান। কারো কারো ধারণা হল এসব মহাকাশের অদৃশ্য অতিথিদের কীর্তি।

নানা ব্যাখ্যা

নানা দেশের বহু বিজ্ঞানী, গবেষক আর লেখক এই রহস্য নিয়ে গবেষণা করেছেন। জাপান, গুয়াম আর ফিলিপাইনের মধ্যেও মনে হয় এমনি এক মৃত্যু-ত্রিভুজ রয়েছে যেখানে বহু জাহাজ আর বিমান অদৃশ্য হয়ে যায়। স্যান্ডারসন নামে একজন মার্কিন গবেষক এ ধরনের রহস্য নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে খোঁজ পেলেন পৃথিবীতে নানা এলাকায় সমুদ্রে এমনি রহস্যময় মৃত্যুগহ্বর আছে মোট দশটি। এগুলি ছড়ানো বিষুবরেখার দু'পাশে আর পরস্পর থেকে ঠিক ৭২ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশ দূরে দূরে।

কেউ কেউ বললেন চৌম্বক ঝড় শুরু হলেই বেতার যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটে। হয়তো কোন কারণে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র বদলে যায়—এমন কি মাধ্যাকর্ষণেও পরিবর্তন ঘটে। কখনো নাকি দেখা যায় বিমান কোন অজানা কারণে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছে গন্তব্য স্থানে।

আবার কেউ বললেন, এসব ঘটনার আসল কারণ হল সমুদ্রের তলায় আকস্মিক ভূমিকম্প। এমনি ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রের ঢেউ উঁচু হয়ে উঠতে পারে হঠাৎ ৬০ মিটার আর সমুদ্রের তলায় এমন গর্তের সৃষ্টি হতে পারে যাতে জাহাজ তলিয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে। কিন্তু এমন ভূমিকম্প যা সমুদ্রের ঢেউ যন্ত্রপাতিতে ধরা না পড়বার কোন কারণ থাকতে পারে না।

আর এক ব্যাখ্যা হল ঝড়ের এলাকায় কখনো কখনো মানুষের শোনার সীমার চেয়ে কম স্পন্দনের শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি হয়। প্রতি সেকেন্ডে ছয় স্পন্দনের তরঙ্গ সৃষ্টি হলে তা হাওয়ায় প্রতি সেকেন্ডে ৩৩০ মিটার এবং পানিতে প্রতি সেকেন্ডে ১,৬৫০ মিটার বেগে—অর্থাৎ ঝড়ের চেয়ে বেশি বেগে—ছড়িয়ে পড়ে; দূরে গেলেও এর শক্তি তেমন কমে না। এই শব্দতরঙ্গ মানুষ শুনতে না পেলেও এতে নাবিকদের মানসিক বিকৃতি, আতঙ্ক এবং দৃষ্টিভ্রম সৃষ্টি হতে পারে।

জাহাজের সঙ্গে এই তরঙ্গের ক্রিয়ার ফলে যে অনুনাদ সৃষ্টি হয় তাতে জাহাজ তলিয়েও যেতে পারে।

ইয়েলকিন নামে একজন সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ বললেন, হয়তো পৃথিবীর ওপর চাঁদের আকর্ষণের তারতম্য দিয়ে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। পৃথিবীর চারপাশে ঘোরার সময় পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের যতেষ্ট কম-বেশি হয়। দেখা যায় দুর্ঘটনাগুলো ঘটছে বেশির ভাগ পূর্ণিমা আর অমাবস্যার সময়—যখন সূর্য, পৃথিবী এবং চাঁদ মোটামুটি এক সরলরেখায় থাকে এবং পৃথিবীর ওপর তাদের যুগ্ম-আকর্ষণের পরিমাণ বেশি হয়। চাঁদ যখন তার উপ-বৃত্তাকার কক্ষপথে অনুসৃত অবস্থায় অর্থাৎ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি আসে তখন অপসৃত অবস্থার চেয়ে তার জোয়ার সৃষ্টির ক্ষমতা বেড়ে যায় চল্লিশ শতাংশ। এমনি সময়ে সমুদ্রের তলায় আগ্নেয় মাগমা চলাচলের ফলে তার চৌম্বক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটতে পারে; তাতে জাহাজের বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতেও গোলমাল দেখা দেয়া বিচিত্র নয়।

যৌথ গবেষণা

১৯৭৭-৭৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা বারমুদা ট্রাঙ্গেল এলাকায় অনুসন্ধান চালাবার জন্য এক যৌথ গবেষণা প্রকল্প হাতে নেন। এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে সোভিয়েত গবেষণা জাহাজ 'আকাদেমিক ভারনাদস্কি' এবং 'মিখাইল লমোনোসভ' এই অঞ্চলে অনেকগুলো সফর করে। এসব সফরে প্রধানত এই অঞ্চলের সমুদ্র ও বায়ুমন্ডলের প্রকৃতি নিয়ে বৈজ্ঞানিক জরিপ চালানো হয়। এক বছর ধরে এই 'শয়তানের ত্রিভুজে' সফর করেও সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এখানে তেমন অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পান নি।

মার্কিন বিজ্ঞানীরা ১৯৪৫ সালের বারমুদা ট্রাঙ্গেল সম্পর্কিত প্রথম ঘটনাটির বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পান যে, হারিয়ে যাওয়া বিমান-গুলির স্কোয়াড্রন লীডার চার্লস টেলরের সঙ্গে বিমান ঘাঁটির কথাবার্তা যাঁরা টাপিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন বলেছেন, যে-ধরনের কথা হয়েছিল বলে প্রচার হয় তা আসলে হয় নি। বিমানগুলি মোটেই পরিষ্কার আবহাওয়ায় হারিয়ে যায় নি। ন'ঘন্টা ধরে ওড়ার পর সন্ধ্যে সাতটায় এগুলি একটি হ্যারিকেনের কবলে পড়ে। আসলে তাঁরা পথ ভুল করে আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে যাচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ

ওড়ার পর তাঁদের জ্বালানি ফুরিয়ে আসে। এদিকে ঝড় ওঠে। ঝড়ের মধ্যেই তাঁরা সমুদ্রের বুকে নামতে চেষ্টা করেন।—কিন্তু ভারি বিমান-গুলি সমুদ্রে ডুবে যায়।

যে বিমানটি তাদের উদ্ধারের জন্য গিয়েছিল সেটি আকাশে বিস্ফোরণ ঘটে ধ্বংস হয়। কাছাকাছি ক'টি জাহাজের লগ বইতে তা উল্লেখ পাওয়া যায়। বিমানটিতে ছিল প্রচুর জ্বালানি। ঝড় উঠায় আকাশে তখন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। সম্ভবত বিদ্যুতের ঝলকে জ্বালা-নিতে আগুন ধরে যায়।

কিন্তু মাঝে মাঝে ঐ এলাকায় জাহাজ থেকে যাত্রীরা বিস্ময়করভাবে অদৃশ্য হয়ে যাবার যে খবর পাওয়া যায় তার রহস্য কি? —মার্কিন পুলিশ একদল অপরাধীকে গ্রেফতার করে যারা আটলান্টিকের ঐ এলাকায় দস্যুবৃত্তি করে বেড়ায়। তারা ছোটখাট জাহাজ দখল করে তার নাবিকদের হত্যা করে; তারপর সে জাহাজ মাদকদ্রব্য পাচার বা চোরাচালান আনানেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। শেষমেষ জাহা-জটি তারা খোলা সমুদ্রে ফেলে পালিয়ে যায়।

বারমুদা ট্রাঙ্গেল এলাকা দিয়ে প্রতি বছর প্রায় দেড় লক্ষ জাহাজ যাতায়াত করে। বছরে বিভিন্ন জাহাজ থেকে বিপদ সংকেত পাওয়া যায় হাজার দশেক। সচরাচর সাহায্যকারী জাহাজ এসে পড়ে ঠিক সময়েই। এই এলাকায় পৃথিবীর আর কোন এলাকার চেয়ে বেশি জাহাজ বিপদে পড়ছে তার কোন প্রমাণ নেই। বিলেতের বনেদী লয়েড্‌স্‌ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী জাহাজ বীমা করার সময় বিপদের ঝুঁকির হিসেব বেশ ভাল করেই বিবেচনা করে দেখে। বারমুদা ট্রাঙ্গেল এলাকা দিয়ে জাহাজ চলাচলের জন্য তারা কখনো বাড়তি প্রিমিয়াম দাবী করে নি। মার্কিন বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বলেছেন, ঐ এলাকায় গত দশ বছরের মধ্যে কোন বিমান বিপদে পড়েছে বলে জানা যায় নি। অবশ্য প্রতি বছর গোটা চারেক জাহাজ এখানে ডোবে। কিন্তু এমন ডোবে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার সমুদ্রেও।

জাপানের কাছে কখনো কখনো একইভাবে জাহাজ অদৃশ্য হবার কথা শোনা যায়। ১৯৫০-৫৪ সালের মধ্যে ন'টি বড় জাহাজ এভাবে উধাও হয়েছে। জাপানী সরকার সে সময়ে 'কারো মার, ৫' নামে যে সন্ধানী জাহাজটি সেখানে তদন্ত করার জন্য পাঠান সেটি একইভাবে অদৃশ্য হয়—তার সাথে অদৃশ্য হয় ২৯ জন নাবিক আর ৭ জন বিজ্ঞানীও। কিন্তু পরে খোঁজ নিয়ে দেখা যায় সে সময়ে

জাপানের সাখালিন দ্বীপেও অন্যান্য ভূ-কম্পকেন্দ্রে ঐ এলাকায় সমুদ্রের তলায় একটি বড় রকম আগ্নেয়গিরি উদ্‌গারের সংকেত ধরা পড়ে। এই উদ্‌গারের ফলেই খুব সম্ভব জাহাজটি ধ্বংস হয়েছিল। সে সময়ে যে উদ্ধার বিমানটিকে সন্ধান করতে পাঠানো হয় সেটি থেকে পানির ওপর প্রচুর ছাই ভাসতে দেখা যায়। এসব কথা চাঞ্চল্যকর সংবাদ সৃষ্টিকারীরা সে সময়ে চেপে গিয়েছিল।

মানুষের শোনার এলাকার চেয়ে কম স্পন্দনের শব্দতরঙ্গের ফলে জাহাজ ডুবে যাওয়ার ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন সোভিয়েত বিজ্ঞানী অ্যাকাদেমিসিয়ান ভাসিলি শুলেইকিন। তিনি বলছেন, এটা সত্যি যে সমুদ্রেরপানির ওপর হাওয়ার বেগ বাড়লে এবং পানির ঢেউ বড় হয়ে উঠলে এমনি নিম্ন স্পন্দনের তরঙ্গ সৃষ্টি হতে পারে। এই তরঙ্গ হারিকেনের বেগের চেয়ে অনেক দ্রুত গতিতে পানির ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে সমুদ্রের জীবনের হারিকেন সম্বন্ধে সতর্ক করে দেয়। কিন্তু অতি বড় হারিকেনেও এমনি নিম্ন স্পন্দনের যে শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি হবে তাতে মানুষের জন্য বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই।

জরিপের ফলাফল

সারগাসো সাগরের পশ্চিম প্রান্তে বারমুদা ট্রাঙ্গেল এলাকায় সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীদের জরিপ চলে দীর্ঘদিন ধরে। দু'দেশেরই গবেষণা জাহাজ এই অনুসন্ধানে অংশ গ্রহণ করে। এই গবেষণায় তাঁরা সমুদ্র প্রবাহ এবং বায়ু প্রবাহ সম্বন্ধে নানা নতুন নতুন তথ্য আহরণ করেছেন। যেমন, বায়ুমণ্ডলে যেমন ঘূর্ণিবায়ু দেখা দেয়, সমুদ্রের পানির গভীর তলদেশে তাঁরা অনেকটা তেমনি ধরনের বহু ঘূর্ণির খোঁজ পান। তার কোনটি ঘোরে ঘড়ির কাটার মতো, আবার তার ঠিক পাশেরটি হয়তো ঘোরে ঘড়ির কাটার উলটো দিকে। কোন ঘূর্ণির কেন্দ্রে পানি ঠান্ডা, আবার কোনটির কেন্দ্রে পানি গরম। একেকটি ঘূর্ণির এলাকার ব্যাস ১২০ কিলোমিটার থেকে ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত। বিভিন্ন ঘূর্ণিতে পানি ঘোরার বেগ বিভিন্ন।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, সম্ভব এসব ঘূর্ণির মূলে রয়েছে উষ্ণ উপ-সাগরীয় স্রোত। এই স্রোতকে আগে মনে করা হত একটি বিশাল নদীর প্রবাহের মতো। এখন দেখাযাচ্ছে আসলে এই স্রোতের মধ্যে রয়েছে অনেক পৃথক পৃথক প্রবাহ—আর তাদের চলাচলের ধরনও

রীতিমতো জটিল। এই প্রবাহ যে শুধু পানি বয়ে নেয় তা নয়, তার সাথে বয়ে নেয় বিপুল পরিমাণ শক্তি—আর তার প্রভাব পড়ে চারপাশের আবহাওয়ায়, সমুদ্রের জীবজন্তুতে এবং জাহাজ চলাচলের ওপরেও। কখনো আবার সিগারেটের ধোঁয়ার কুন্ডলির মতো পানির বিশাল কুন্ডলি মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

বিজ্ঞানীরা এই এলাকার পানিতে কোন মাছ দেখতে পান নি। আগে লোকে বলত সারগাসো নামে বিশাল আর ঘন জলজ উদ্ভিদের পাঁজায় নৌকা আর জাহাজ জড়িয়ে যায়; তাতে নাবিকরা তেষ্টা-তেই মারা পড়ে। কিন্তু এ ধরনের সম্ভাবনার কোন নমুনা বিজ্ঞানীরা দেখতে পান নি। বারমুদা ট্রাঙ্গেল এলাকার সমুদ্র অতি শান্ত আর স্বচ্ছ টলটলে নীল পানি। তার ওপর দিয়ে হালকা সবুজ রঙের অল্প-স্বল্প সারগাসো ভেসে যাচ্ছে—তাতে কোন ডিঙ্গি নৌকাও জড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা নেই। এই এলাকায় সমুদ্রের তলভূমিতে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটার (যাতে ৬০ মিটার উঁচু ঢেউ উঠে জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারে) অথবা হঠাৎ চৌম্বক ক্ষেত্র বদলে যাবার কোন চিহ্নও বিজ্ঞানীরা দেখেন নি। বারমুদা ট্রাঙ্গেলের তিন কোণাতেই মার্কিন ভূকম্পকেন্দ্র বসানো আছে, কাজেই সে ধরনের কোন কিছু ঘটলে এসব যন্ত্রে তার হদিস নিশ্চই ধরা পড়ত।

আজকাল সমুদ্রের পানির তলায় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞানীরা 'ব্যাথিস্কাফ' নামে সমুদ্রযান উদ্ভাবন করেছেন। জাক পিকারের চালনায় শক্তিশালী ব্যাথিস্কাফ 'বেন, ফ্রাংকলিন' পানির চারশ থেকে দু'শ মিটার তলা দিয়ে বারমুদা ট্রাঙ্গেল অঞ্চলকে চষে বেড়িয়েছে। এতে বারো জন আরোহী ত্রিশ দিন ধরে সমুদ্রের তলা দিয়ে উপ-সাগরীয় স্রোতের সাথে ভেসে বেড়িয়ে নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে। সাগরযানের স্বচ্ছ জানালা দিয়ে অনবরত সমুদ্রের ছবি তুলেছে। সেখানে অস্বাভাবিক কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় নি।

এরপর ১৯৮২ সালে সোভিয়েত গবেষণা জাহাজ 'ভিতিয়াজ' আবার বারমুদা ট্রাঙ্গেল এলাকায় অনুসন্ধান চালায়। এটি সেখানে একবার হারিকেনের কবলে পড়ে, একবার বেতার যোগাযোগে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ রকম ঘটনা নিরীক্ষায় এলাকার অন্য জায়গার সমুদ্রেও দেখা দেয়া বিচিত্র নয়।

এসব থেকে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে বারমুদা ট্রাঙ্গেল সম্বন্ধে যে সব কথা শোনা যায় সেগুলো প্রায় সবই হয় গালগল্প অথবা মুখরোচক

প্রচার মাত্র। এর পেছনে হয়তো একটা বণিকবুদ্ধির ব্যাপারও রয়েছে। বারমুদার প্রধান আয়ের উৎস হল পর্যটন। প্রতি বছর হাজার হাজার লোক সেখানে বেড়াতে যায়। সমুদ্রে নৌকা বিহার করে। নানা রকম রহস্যজনক ঘটনার কথা প্রচার করে লোকের কৌতূহল জিইয়ে রাখা পর্যটন ব্যবসায়ীদের জন্য রীতিমতো লাভজনক। তাই প্রচার মাধ্যমে বারমুদা ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে নানা রমরমা খবরের বেসাতি চলছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর।

বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানের ফলাফল প্রকাশের পরও হয়তো এই বেসাতি চলতেই থাকবে।

ডিসেম্বর, ১৯৮৬

bi

পৃথিবীর ওপর সন্ধানী চোখ

মানুষ তার উদ্ভবের শুরু থেকেই পৃথিবীর সম্পদ ব্যবহার করে আসছে। চারপাশের হাওয়া-পানি-মাটি, গাছ-গাছালির ফলমূল, লতা-পাতা-কাঠ, খেতের ফসল, মাটির তলা থেকে খুঁড়ে তোলা তামা, লোহা, কয়লা, তেল ইত্যাদি খনিজ বস্তু ব্যবহার করে মানুষ বেঁচে থেকেছে, সৃষ্টি করেছে জীবনযাত্রার নানা উপকরণ, গড়ে তুলেছে তার আজকের সভ্যতা।

কিন্তু পৃথিবীর এসব সম্পদ কি অফুরন্ত? প্রকৃতি কি চিরকাল অকৃপণ হাতে মানুষকে যুগিয়ে যেতে থাকবে তার দরকার আর চাহিদা মতো সব উপকরণ? এ প্রশ্ন নিয়ে মানুষের আগে তেমন মাথা ঘামাবার প্রয়োজন হয় নি। এমন কি এই শতকের মাঝামাঝিও প্রশ্নটা তেমন বড় হয়ে দেখা দেয় নি। বহু হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা ছিল কম; রোগে-মহামারীতে বনজঙ্গুর কবলে, প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগে তার জীবন-নাশের হার ছিল বেশি। চার-পাশে দুনিয়ার সম্পদ মনে হত অঢেল; আর এই অঢেল সম্পদে যে ঘাটতি পড়তে পারে এ আশংকা আজকের মতো মানুষকে কখনো ভাবিয়ে তোলে নি।

এর মধ্যে অবস্থা অনেক বদলে গিয়েছে। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা একশ' কোটি থেকে বেড়ে দু'শ কোটি হতে লেগেছিল গোটা উনিশ শতক। অথচ দেখা যাচ্ছে বিশ শতক শেষ হবার আগেই জনসংখ্যা দু'শ কোটি থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ছ'শ কোটির ওপরে। এই বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার চাপে ক্রমে ক্রমে কমে যাচ্ছে পৃথিবীর বনভূমির এলাকা; কমছে চাষের জমির পরিমাণ; অভাব দেখা দিচ্ছে সুপেয় পানির, তেল-কয়লা এসব জ্বালানির, নানা ধরনের খনিজ ধাতুর। অন্য দিকে বাড়ছে উষর মরুভূমির পরিধি; রাসায়নিক উপদ্রব্যে দূষিত হচ্ছে নদী-নালা, খাল-বিল, সমুদ্রের পানি, ধোঁয়ায়-ধুলোয় বিষাক্ত গ্যাসে আচ্ছন্ন হচ্ছে চারপাশের বায়ুমন্ডল; বদলে যাচ্ছে জলবায়ু। আর

এ সব কিছুই আজ প্রভাব ফেলছে মানুষের জীবনের ওপর, তার সভ্যতার ভবিষ্যতের ওপর।

সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীরাই এ সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। উপায় বের করতে চাইছেন কি করে পৃথিবীর সম্পদ এমনভাবে হিসেব করে ব্যবহার করা যায় যাতে মানুষের পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট না হয়, মানুষের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়ে না ওঠে। এর জন্য দরকার পৃথিবীর সবরকমের সম্পদ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ, চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য, মানুষের ক্রিয়াকলাপ আর তার ফলাফল সম্পর্কে খবরাখবর। এসব তথ্য চাই ক্রমাগত, সারা বছর ধরে, আর দুনিয়ার সব দেশ সম্পর্কে। মানুষের পরিবেশে অনবরতই যেসব পরিবর্তন ঘটে চলেছে তা যদি সর্বক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাহলে সে অনুযায়ী মানুষ তার চারপাশের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর তাহলে হয়তো দীর্ঘকাল ধরে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পারে মানুষের সভ্যতার অগ্রযাত্রা।

আজ অবশেষে পৃথিবীর সম্পদ আর পরিবেশের ওপর সর্বক্ষণ এমনি সন্ধানী চোখ রাখা সম্ভব হচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে। এসব কৃত্রিম উপগ্রহে বসানো হয় এমন সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি যা কয়েকশ' কিলোমিটার ওপর থেকে পৃথিবীর সম্পর্কে নানা খবরাখবর সংগ্রহ করে যায় দিনরাত আর নির্ভুলভাবে মানুষকে সরবরাহ করতে থাকে সে সব খবর।

দূর থেকে খবর

বিজ্ঞানীরা তাঁদের পরীক্ষাগারে যন্ত্রপাতি দিয়ে মেপে অনেক বিষয়ে খবর পান হাতেনাতে। কিন্তু আবার অনেক কিছু সম্পর্কে হাতেনাতে খবর যোগাড় করা যায় না। সেখানে খবর নিতে হয় দূর থেকে; কখনো সে খবরের অর্থও উদ্ধার করতে হয় নানা কৌশলে। মানুষ চাঁদের বুকে গিয়ে নামার ৩৬০ বছর আগেই গ্যালিলিও তাঁর দূরবীনের চোঙে চোখ লাগিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন চাঁদ মোটেই রুপোলি চাকতি নয় বিশাল একটা গোলক—তার ওপর আছে পাহাড় আর খাদ। বহু কোটি কিলোমিটার দূরের সূর্য আর তারাদের আলো পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা বলতে পারেন তাদের দেহ তৈরী কি কি উপাদান দিয়ে। রেডারের সূক্ষ্ম তরঙ্গ ছুঁড়ে দিয়ে আজ সহজেই জানা যায় সমুদ্রে কত দূরে আছে জাহাজ, আকাশে কোথায় আছে বিমান অথবা দূরে কোন্ থেকে ধেয়ে আসছে ঝড়ো মেঘ।

পৃথিবীর ওপরকার খবর দূর থেকে নেবার একটা আশ্চর্য নতুন উপায় পাওয়া গেল ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর তারিখে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুৎনিক-১ আকাশে ওঠার ফলে। তার মাত্র একমাস পরই আকাশে উড়ল আরো অনেক বড় উপগ্রহ স্পুৎনিক-২; তাতে বসানো 'লাইকা' নামে এক জীবন্ত কুকুর। লাইকা-র খবরাখবর পৃথিবীতে বিজ্ঞানীদের কাছে এসে পৌঁছতে লাগল রেডার-তরঙ্গে ভর করে।

১৯৬০ সালের ১ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আকাশে ছুঁড়ল প্রথম আবহাওয়া উপগ্রহ টাইরস-১। TIROS কথাটা হল **Television and Infrared Observation Satellite** এই লম্বা নামের সংক্ষেপ। এই উপগ্রহ থেকে বিজ্ঞানীরা পেতে লাগলেন পৃথিবীর নানা এলাকার মেঘের ছবি। এরপর পৃথিবীর ওপর আরো অনেক আবহাওয়া উপগ্রহ ছোঁড়া হয়েছে। সেগুলো নিচ্ছে হাওয়ার উষ্ণতা, বেগ, জলীয় বাষ্প, পানি বা বরফের কণা ইত্যাদি নানা কিছুর খবর। তারপর এসব খবর পৌঁছচ্ছে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের কাছে। আবহাওয়া উপগ্রহ ছাড়া আরো নানা ধরনের দূরাভাস উপগ্রহ ঘুরছে পৃথিবীর চারপাশে।

দূর থেকে এমনি করে খবর নেয়ার জন্যে বিজ্ঞানীদের প্রধান উপায় হল আলো বা রেডারের ঢেউ। বিজ্ঞানীরা বলেন এ দুইই আসলে এক ধরনের তরঙ্গ—তাদের এক কথায় বলা যায় তড়িৎচুম্বক তরঙ্গ। তাপরশ্মিও পড়ে এই তরঙ্গের দলে। এদের মধ্যে তফাত আসতে শুধু তাদের ঢেউ-এর দৈর্ঘ্যে। রেডারের ঢেউ সবচাইতে লম্বা। তারপর আসে তাপরশ্মি, তার চেয়ে ছোট আলোক-রশ্মি।

মহাকাশ থেকে পৃথিবীর ওপর নজর রাখার জন্য যেসব ঢেউ ব্যবহার করা হয় তার মাপের হিসেবটা নেয়া যাক। এক মিটার হল এক গজের চেয়ে সামান্য একটু লম্বা (৩৯·৩৭ ইঞ্চি)। এক মিটারের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগকে বলা হয় মাইক্রোমিটার। মোটামুটি ০·৩ মাইক্রোমিটার থেকে ১৫·০ মাইক্রোমিটার মাপের ঢেউ ধরা পড়ে কৃত্রিম উপগ্রহের যন্ত্রে। আমরা যে আলো দেখি তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ০·৩৮ মাইক্রোমিটার (এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের দেড় ভাগ—বেগুনি রঙের আলো) থেকে ০·৭৬ মাইক্রোমিটার (এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের প্রায় তিন ভাগ—লাল রঙের আলো)। ০·৭৬ থেকে ৩·০ মাইক্রোমিটার লম্বা তরঙ্গকে বলা হয় অবলোহিত তরঙ্গ। এর চেয়ে লম্বা মাপের ঢেউ হল তাপরশ্মি।

সূর্যের রশ্মি পৃথিবীর ওপর পড়লে নানা বস্তু তাকে নানাভাবে ঠিকরে ফিরিয়ে দেয়। এই ঠিকরে দেয়া রশ্মির ছবি তোলা হয় কৃত্রিম উপগ্রহের শক্তিশালী ক্যামেরার সাহায্যে। পৃথিবীর ওপরকার নানা বস্তু নিজেদের গা থেকে নানা মাপের তাপরশ্মিও ছড়িয়ে দেয় চারপাশে। উপগ্রহ যে সব ছবি নেয় তা থেকে তৈরি হয় নানা রঙের ছবি। সেই ছবির রঙ থেকে বোঝা যায় কোন্ অংশ পানি, কোথায় চষা খেত, কোথায় মরুভূমি, কোথায় বন বা কোথায় মাটিতে রয়েছে খনিজ বস্তু।

খবর নেবার উপগ্রহ

ঠিক এই মুহূর্তে প্রায় ন'শ কিলোমিটার উঁচু দিয়ে পৃথিবীর চারপাশে অনবরত ঘুরে চলেছে প্রায় এক টন ওজনের একটি কৃত্রিম উপগ্রহ। এটা একবার পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে আসতে সময় লাগে ১০৩ মিনিট। আর এর পথ এমনভাবে বসানো যেন এটি দিন-রাত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ বার পৃথিবীকে পাক খেয়ে ১৬ দিন পর আবার একই সময়ে একই জায়গায় বিষুব রেখাকে অতিক্রম করে। ঘোরার সময় এই উপগ্রহের শক্তিশালী ক্যামেরা পৃথিবীর ওপরকার ১৮৫ কিলোমিটার চওড়া জায়গার ছবি তুলে নিতে থাকে। এমন সূক্ষ্ম এই ছবি যে ত্রিশ মিটারের চেয়ে বড় আকারের যে কোনো জিনিস এতে স্পষ্ট চেনা যায়। প্রতিবার পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতে এর পথ খানিকটা করে পশ্চিমে সরে যায়। এভাবে ষোল দিনে ঘুরপাক খেতে খেতে সারা পৃথিবীর ছবি তোলা হয়ে যায়; উপগ্রহটি তখন আবার সেই আগের জায়গা থেকে ছবি তুলতে শুরু করে।

এই উপগ্রহটি হল আমেরিকার 'ল্যান্ডস্যাট, ৫'। এটি মহাকাশে ছোঁড়া হয়েছে ১৯৮৪ সালে। এর আগেই চারটি 'ল্যান্ডস্যাট্' ছোঁড়া হয়েছিল যথাক্রমে ১৯৭২, ১৯৭৫, ১৯৮২ আর ১৯৮৩ সালে। কিন্তু সেগুলোর চেয়ে ল্যান্ডস্যাট্ ৫ আরো উন্নত। এতে পৃথিবীর নানা বস্তু সম্পর্কে আগের চাইতে নিখুঁতভাবে খবরাখবর নেয়া সম্ভব হচ্ছে। আর সে সব খবর সরবরাহ করা হচ্ছে দুনিয়ার নানা দেশকে। পৃথিবীর প্রায় সোয়াশ' দেশ আজ ল্যান্ডস্যাটের তথ্য পেয়ে তাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের জরিপ চালাতে পারছে।

নানা দেশে ল্যান্ডস্যাটের ছবির সাথে মিলিয়ে দেখা হচ্ছে বিভিন্ন এলাকার ফসলের প্রকৃত ফলন কত। দেশে কোন্ ফসলের ফলন কি

পরিমাণ হবে তার হিসেব কৃত্রিম উপগ্রহের ছবি থেকে ৮০ শতাংশ শুদ্ধভাবে জানা যায়। আমেরিকার মতো দেশে যেখানে গমের খেত হয় বিশাল আকারের সেখানে এই শুদ্ধতার পরিমাণ ৯৫ শতাংশ। ফসলের খেতে পোকা লাগবে বা ফসলের আর কোন্ ক্ষতি হলে তার পরিমাণও সহজে জানা যায় উপগ্রহের ছবি থেকে।

থাইল্যান্ডে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে ১৯৭৩ আর ১৯৭৬ সালের পাওয়া ছবি মিলিয়ে দেখা যায় এই সময়ে দেশের উত্তরাঞ্চলে সাতটি প্রদেশে প্রায় দেড় হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকার বন কেটে ফেলা হয়েছে। এর ফলে সে দেশে নতুন বৃক্ষ রোপনের কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। উপগ্রহ থেকে এমনি বন ধ্বংস হবার খবর পাওয়া গেছে ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল এবং আরো নানা দেশে। ফিলিপাইনে বনাঞ্চল ধ্বংস করে মানুষ কিভাবে আবাসিক এলাকা গড়ে তুলেছে তার স্পষ্ট ছবি পাওয়া যাচ্ছে উপগ্রহ থেকে।

বাংলাদেশে ও ভারতে বছরের বিভিন্ন সময়ে নদীতে পানির পরিমাণ জানবার জন্যে এসব ছবি বেশ কাজে আসছে। বিশেষ করে কোন এলাকায় প্লাবন দেখা দিলে ঠিক কোন্ কোন্ এলাকায় কতটা প্লাবন হয়েছে তা সহজেই জানা যায় এসব ছবি থেকে।

পাকিস্তানে ল্যান্ডস্যাট ছবি থেকে জানা যাচ্ছে দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় কোথায় তামার খনি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে তার কথা। সিন্ধু নদীর মোহনায় কি ভাবে পলি পড়ছে সে সম্বন্ধেও অনুসন্ধান চলছে। নদীতে বা সমুদ্রের উপকূলে পানি কিভাবে দূষিত হচ্ছে তারও খবর পাওয়া যাচ্ছে এসব ছবি থেকে। ইন্দোনেশিয়ায় উপগ্রহের ছবির সাহায্যে দেশের বড় আকারের (১ : ২৫০,০০০ স্কেল বা ১ সে. মি. = ২.৫ কিলোমিটার) নিখুঁত মানচিত্র তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বলা বাহুল্য মহাকাশের এসব ছবি বিনে পয়সায় পাওয়া যায় না। ছবি পাবার জন্য মার্কিন মহাকাশ সংস্থাকে বার্ষিক মোটা হারে নজরানা দিতে হয়। কোন দেশ এসব ছবি পাবার ভূকেন্দ্র স্থাপন করতে চাইলে তার খরচ অন্তত এক কোটি ডলার। তা ছাড়া এই কেন্দ্র চালু রাখার খরচও বছরে দশ লাখ ডলারের কাছাকাছি।

বিপদের কথাও ভাবতে হবে

এছাড়া একটি বড় সমস্যা হলো বিভিন্ন দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার প্রশ্ন। ল্যান্ডস্যাটের ক্যামেরার সূক্ষ্মতা ভবিষ্যতে আরো বাড়ানো হবে; তখন মাটিতে দশ মিটার চওড়া জিনিসও সহজেই চেনা যাবে এসব ছবি দেখে (ইতিমধ্যে ফরাসীরা 'স্পট' নামে যে কৃত্রিম উপগ্রহ ছুঁড়েছে তার ছবিতে দশ মিটারের বড় যে কোন জিনিস চেনা যায়)। একটি দেশের ভেতর কি ঘটছে না ঘটছে তার সব খবর আরেক দেশ জেনে যাক এটা প্রথম দেশ হয়তো নাও চাইতে পারে। এসব খবর শত্রুতামূলক কাজে বা ব্যবসা-বাণিজ্যে সুবিধে আদায়ের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু আজকের কৃত্রিম উপগ্রহের যুগে কোন দেশের এমন কি কোন মানুষেরও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখার উপায় কি?

ল্যান্ডস্যাট ছাড়াও আরো নানা ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর ওপরকার খবরাখবর নিচ্ছে। 'মেটস্যাট' উপগ্রহ নিচ্ছে আবহাওয়ার খবর; 'জিওস্যাট' নিচ্ছে ভূপ্রকৃতি ও খনিজ বস্তুর খবর; 'সীস্যাট' নিচ্ছে সমুদ্রের পানির আর উপকূলের নানা খবরাখবর। এসব অনেক খবর মানুষের প্রচুর কাজে লাগছে। যেমন সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড়ের আগাম খবর আজ পাওয়া যাচ্ছে সহজেই। কোথায় বনে লেগেছে দাবানল আগ্নেয়গিরিতে ঘটেছে উদগার, জাহাজ বা বিমান পড়েছে বিপদে—যত দুর্গম আর বিজন এলাকাতেই হোক—তার খবর আজ মানুষ পেয়ে যাচ্ছে সাথে সাথে। কিন্তু এই উপকারী দিকের পাশাপাশি এর বিপদের দিকটার কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে।

জাতিসংঘের উদ্যোগে মহাকাশের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কে বিচারবিবেচনা চলছে। কখনো এসব বিষয় নিয়ে তুমুল বিতর্কও হচ্ছে। মহাকাশ থেকে যে সব ছবি বা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা যেন শুধু শান্তির কাজে ব্যবহার করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য কিছু সর্বসম্মত নীতিমালা উদ্ভাবনের চেষ্টা করা হচ্ছে। এই চেষ্টা সফল না হলে দুনিয়ার দুর্বল দেশগুলির জন্য সমূহ বিপদ সে কথা বলাই বাহুল্য।

মে, ১৯৮১/ডিসেম্বর, ১৯৮৬

হ্যালি : বিজ্ঞানী আর ধূমকেতু

হ্যালি আমাদের একটি অতি পরিচিত ধূমকেতুর নাম। এডমন্ড হ্যালি (১৬৫৬-১৭৪২) নামে সতের-আঠার শতকের একজন ইংরেজ জ্যোতির্বিদের নামে এর নামকরণ। প্রতি ৭৫-৭৬ বছর পর এটি পৃথিবীর আকাশে দেখা দেয়। এই শতকে এটি একবার দেখা গিয়েছিল ১৯১০ সালে। আবার ১৯৮৬ সালের ১১ এপ্রিল তারিখে এই ধূমকেতু পৃথিবীর কাছে অর্থাৎ ছ'কোটি কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছয়।

আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী কোন ধূমকেতু যিনি প্রথম আবিষ্কার করেন তার নামেই সেটির নামকরণ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে এডমন্ড হ্যালি যে একে প্রথম দেখেছিলেন তা নয়, তবে ১৬৮২ সালে এই ধূমকেতুর গতিবিধি পরীক্ষা করে ধূমকেতুরা যে আমাদের আকাশে ঘুরে ঘুরে আসা নিয়মিত অতিথি এই তথ্য তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। আর ১৬৮২ সালে দেখা ধূমকেতুর ১৭৫৮ সালে আবার পুনরাবির্ভাব ঘটবে এই সঠিক ভবিষ্যদ্বাণীও তিনি করেছিলেন।

হ্যালি ছিলেন লন্ডনের একজন ব্যবসায়ীর সন্তান। ছেলেবেলায় তিনি অত্যন্ত উদার পরিবেশে বড় হন। অল্প বয়সেই নানা বিষয়ের মধ্যে বেশ কটি বিদেশী ভাষা তাঁর আয়ত্ত হয়। তিনি যখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন লন্ডনের কাছে রাজকীয় গ্রীনিচ মানমন্দির কেবল তৈরি হয়েছে। ছুটির সময়ে তিনি এই মানমন্দিরে কাজ করতে আরম্ভ করেন। মাত্র বিশ বছর বয়সে তিনি মানমন্দিরের প্রথম পরিচালক জন ফ্লামস্টীডের সহায়তায় এক বন্ধুকে নিয়ে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে চলে যান দক্ষিণ গোলার্ধের তারকামণ্ডলগুলোর মানচিত্র তৈরির কাজ নিয়ে। তাঁর এই কাজ এমন উঁচু মানের হয় যে, তাতে ফ্লামস্টীড অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এই কাজের জন্যই তাকে এম. এ. ডিগ্রী দান করে।

এর কিছুদিন পর হ্যালি আইজাক নিউটনের সংস্পর্শে আসেন। এর মধ্যে তিনি ধূমকেতু নিয়ে বেশ চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। কেপলার বলেছিলেন গ্রহেরা সূর্যের চারপাশে ঘোরে উপবৃত্তাকার পথে, কিন্তু ধূমকেতুরা চলে সরল রেখায়। ১৭৮২ সালের নভেম্বর মাসে যে ধূমকেতু দেখা যায় হ্যালি তার পথ হিসেব করতে গিয়ে হিমশিম খেতে লাগলেন। নিউটনের সাথে আলাপ করে তিনি জানতে পেলেন সূর্য ও গ্রহদের মধ্যেকার আকর্ষণের নিয়ম নিউটন হিসেব করে বের করেছেন এবং তাতে দেখা যাচ্ছে মহাকর্ষ একটি বিশ্বজনীন বল। হ্যালি নিউটনকে পরামর্শ দেন এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করতে; পরে হ্যালিরই উৎসাহে ও অর্থব্যয়ে সেই বিখ্যাত বই 'প্রিনসিপিয়া ম্যাথেমেটিকা' ১৬৮৭ সালে প্রকাশিত হয়। নিউটনের সূত্রগুলি ধূমকেতুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে হ্যালি দেখলেন এরাও সূর্যের চারপাশে ঘোরে অতি লম্বা উপবৃত্তাকার পথে।

১৬৮২ সালের ২২ নভেম্বর হ্যালি যে ধূমকেতুটি দেখেছিলেন তার আগে ১৯ আগস্ট তারিখে প্রথম দেখেন জার্মানীতে ডোরফেল নামে একজন জ্যোতির্বিদ। এরপর একে দেখা যায় প্যারি ও গ্রীনিচ মানমন্দির থেকে। গ্রীনিচে ধূমকেতুটি দেখেন রাজকীয় জ্যোতির্বিদ জন ফ্লামস্টীড। এই ধূমকেতুটি প্রথম যিনি দেখেছিলেন তাঁর নামে নামকরণ করলে হয়তো এর নাম হত ডোরফেল ধূমকেতু। হ্যালির কৃতিত্ব হল তিনি হিসেব করে দেখতে পান এর গতিপথ ১৫৩১ এবং ১৬০৭ সালে দেখতে পাওয়া ধূমকেতুর অনুরূপ। এ থেকে তিনি একটি অত্যন্ত সাহসী সিদ্ধান্তে পৌঁছান--সে হল এই তিনটি আসলে একই ধূমকেতু, আর এটি ৭৫-৭৬ বছর পর পর ঘুরে ঘুরে পৃথিবীর আকাশে দেখা দিচ্ছে। তাহলে এটি আবার পৃথিবী থেকে দেখা যাবার কথা ১৭৫৮-৫৯ সালে।

হ্যালির মৃত্যু হয় ১৭৪২ সালে--৮৬ বছর বয়সে। কাজেই এই ধূমকেতুর পুনরাবির্ভাব তিনি নিজে দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু ১৭৫৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর অর্থাৎ বড়দিনের রাতে জার্মানীর ড্রেস-ডেনে জন পালিৎশ্ নামে একজন শৌখিন জ্যোতির্বিদ একটি ছোট দূরবীন দিয়ে একে প্রথম দেখতে পেলেন। ১৭৫৯-এর শুরুতে আরো অনেকে দেখলেন একে। হ্যালির হিসেবের যথার্থতা প্রমাণিত হল। ধূমকেতুরা যে সত্যি সত্যি সূর্যের চারপাশে ঘুরপাক খায় অতি

লম্বা উপবৃত্তাকার পথে তাঁর এই আবিষ্কারের কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে হ্যালির নাম চিরতরে যুক্ত হল ধূমকেতুটির নামের সাথে।

এখানে উল্লেখ্য যে, এডমন্ড হ্যালি ১৭২০ সালে ফ্লামস্টীড-এর উত্তরাধিকারী হিসেবে বিলেতের রাজকীয় জ্যোতির্বিদ এবং গ্রীনিচ মানমন্দিরের পরিচালক নিযুক্ত হন। সে সময়ে আইজাক নিউটনের উজ্জ্বল প্রতিভার আলোকে নিষ্প্রভ না হলে নিজের গৌরবেই তিনি বিজ্ঞানের জগতে ভাস্বর হয়ে থাকতেন।

আজ বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলছেন, ২৪০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে চীনা জ্যোতির্বিদরা যে ধূমকেতুটি দেখেছিলেন সেটিই এই ধূমকেতু দেখার প্রথম লিখিত নজির। তাহলে ১৯৮৫-৮৬ সালে যে হ্যালির ধূমকেতু দেখা যায় এটা ঐতিহাসিক কালে এই ধূমকেতুর ত্রিশতম আবির্ভাব। অবশ্য বিজ্ঞানীদের ধারণা সম্ভবত ধূমকেতুটি বহু লক্ষ বছর ধরে ঘুরতে ঘুরতে ইতিমধ্যে প্রায় দু'হাজার বার সূর্যের কাছাকাছি এসেছে এবং আরো প্রায় হাজার বার আসবে।

হ্যালির ধূমকেতু ১৭৫৮ সালের পর দেখা দেয় ১৮৩৫ সালে। কিন্তু তখনও ফটো তোলার ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয় নি; তাই হাতে আঁকা কিছু স্কেচ ছাড়া এই ধূমকেতুর কোন ছবি নেই। এরপর ১৯১০ সালে যখন ধূমকেতুটি ফিরে আসে তখন পৃথিবীর নানা দেশে মানমন্দির থেকে এর ছবি তোলার ব্যবস্থা করা হয়। জার্মানীর হাইডেলবার্গ মানমন্দিরে ম্যাক্স ওল্ফ্ ১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই দূরবীনের সাহায্যে এর প্রথম ছবি তোলেন। ধূমকেতুটি তিনি খালি চোখে দেখেন ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে। এই ধূমকেতু সূর্য আর পৃথিবীর মধ্য দিয়ে যাবার সময় ১৯ মে তারিখে এর লেজ পৃথিবীকে ছুঁয়ে যায়। তখন পৃথিবী থেকে ধূমকেতুর দূরত্ব ছিল ২১ কোটি কিলোমিটার। এর শেষ আলোকচিত্র নেয়া হয় ১৯১০ সালের জুন মাসে। তারপর সাত দশক ধরে এর কোন হদিস পাওয়া যায় নি।

অবশেষে ১৯৮২ সালের ১৬ অক্টোবর তারিখে ক্যালিফোর্নিয়ার পালোমার মানমন্দিরের শক্তিশালী দূরবীনে তোলা ছবিতে আবার এর হদিস মিলল। তখন এই ধূমকেতু শনিগ্রহের কক্ষপথ থেকেও দূরে রয়েছে। একে বাইনোকুলার দিয়ে বৃষ রাশিতে দেখা গেল ১৯৮৫-র

নভেম্বর মাসে, আর খালি চোখে মীন রাশিতে ডিসেম্বর মাসে। হ্যালির ধূমকেতু সূর্যের চারপাশে তার উপবৃত্তাকার পথের অনুসূর অবস্থায় অর্থাৎ সূর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি আসে ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ তারিখে। সূর্যের আড়াল ঘুরে দীর্ঘ পথে দূরে চলে যাবার সময় এটি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে ১১ এপ্রিল তারিখে।

১৯১০ সালে যখন হ্যালির ধূমকেতু দেখা দেয় তখন আলোকচিত্র গ্রহণ ছাড়াও সারা পৃথিবীতে যোগাযোগের ব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে। তার ফলে এই ধূমকেতু দেখা নিয়ে সেবার প্রচুর হইচই হয়েছিল। অবশ্য তখনও ধূমকেতু সম্বন্ধে মানুষের মনে নানা রকম ভুল ধারণা ছিল। যেমন অনেকে মনে করেছিল ধূমকেতুর লেজের ধাক্কায় পৃথিবী ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে, অথবা তার বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে পৃথিবীর সব মানুষ আর জীবজন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে।

এবার যখন হ্যালির ধূমকেতু এল তার মধ্যে মহাকাশ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আরও অনেক এগিয়েছে। মানুষ নভোযান পাঠাতে শুরু করেছে সৌরজগতের দিকে দিকে। কম্পিউটারের সাহায্যে এসব নভোযানকে নিয়ন্ত্রণ করার, তাতে বসানো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে নানা মাপজোখ নেবার, বহু কোটি কিলোমিটার দূরে থেকে সে সব মাপজোখের খবর পাবার আর ছবি তোলার কৌশল মানুষ আয়ত্ত করেছে। এসব কৌশল কাজে লাগিয়ে হ্যালির ধূমকেতুর মাপজোখ নেবার জন্য পাঁচটি নভোযান পাঠাবার আয়োজন চলছিল বেশ ক'বছর আগে থেকেই। তার মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন পাঠায় 'ভেগা ১' আর 'ভেগা ২' নামে দু'টি নভোযান ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে। জাপান পাঠায় 'সাকিগাকে' (পথিকৃৎ) আর 'সুইসেই' (ধূমকেতু) নামে দু'টি নভোযান—১৯৮৫-এর জানুয়ারি আর আগস্ট মাসে। ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা ১৯৮৫-র জুলাই মাসে পাঠায় 'জিয়ত্তো' নামে নভোযান। শেষেরটি হ্যালির ধূমকেতুর কেন্দ্রের মাত্র ৫০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে যাবার পরিকল্পনা করা হয়।

ভেগা ১ ও ভেগা ২

হ্যালির ধূমকেতুর কাছাকাছি সবচেয়ে আগে গিয়ে পৌঁছয় 'ভেগা' নামে সোভিয়েত নভোযান। রুশ ভাষায় ভেনাস আর হ্যালি এই দুটো শব্দের আদ্য অক্ষর জুড়ে তৈরি 'ভেগা' নামটি। ১৯৮৪ সালের ১৫

ডিসেম্বর ও ২১ ডিসেম্বর যথাক্রমে ভেগা ১ আর ভেগা ২ ছোঁড়া হয়। দু'টি নভোযানই ১৯৮৫ সালের জুন মাসে পৌঁছয় শুক্রগ্রহের এলাকায়; এরা সেখানে বেলুনের সাহায্যে আলতোভাবে নামিয়ে দেয় পর্যবেক্ষণের যন্ত্রপাতি, তারপর ছুটে চলে হ্যালির সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। দু'টি নভোযান ৬ মার্চ ও ৯ মার্চ ১৯৮৬ তারিখে ধূমকেতুর কেন্দ্র থেকে যথাক্রমে ন'হাজার ও সাত হাজার কিলোমিটার দূর দিয়ে অতিক্রম করে। ভেগা নভোযান দু'টিতে ধূমকেতুর ধুলো আর গ্যাসের আকার-প্রকৃতি ও পরিমাণ, চৌম্বকক্ষেত্র, বেতার তরঙ্গ, আলোক প্রতিফলন, কেন্দ্রের এবং গ্যাসকণার তাপমাত্রা প্রভৃতির মাপজোখ নেবার ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া ধূমকেতু-কেন্দ্রের রঙিন ছবি নিয়েও পৃথিবীতে পাঠানো হয়।

সাকিগাকে ও সুইসেই

জাপান এই দু'টো নভোযান পাঠায় যথাক্রমে ৮ জানুয়ারি ও ১৯ আগস্ট ১৯৮৫ তারিখে। সাকিগাকে-র নাম প্রথমে ছিল এম. এস. টি. ৫। তেমনি সুইসেই-এর নাম প্রথমে ছিল প্ল্যানেট-এ। এগুলি উৎক্ষেপণের পর নাম পালটানো হয়। ৮ মার্চ ১৯৮৬ তারিখে সাকিগাকে হ্যালির ৭০ লক্ষ কিলোমিটার দূর দিয়ে যায়; একই দিনে ধূমকেতুর দেড় লক্ষ কিলোমিটার দূর দিয়ে যায় সুইসেই। এই নভোযান দু'টি মাত্র ৭৯ সে. মি. উঁচু; এতে চৌম্বকক্ষেত্র, সৌরবায়ু ও বেতার তরঙ্গ মাপবার জন্য বার কিলোগ্রাম ওজনের যন্ত্রপাতি বসানো হয়। এর ক্যামেরায় অতিবেগুনি আলোতে নেয়া ছবিতে দেখা যায় হাইড্রোজেন গ্যাস নিঃসরণের ফলে ধূমকেতুর বিশাল মুণ্ডের উজ্জ্বল্য প্রতি ৫৩ ঘণ্টায় কমে-বাড়ে, এতে মনে হয় মোটামুটি দু'দিনে ধূমকেতুটি একবার করে ঘুরপাক খায়। পরে বিজ্ঞানীরা এই মত সংশোধন করে বলেছেন খুব সম্ভব লম্বা অক্ষের চারপাশে হ্যালি মোটামুটি সাড়ে সাত দিনে একবার পাক খায়।

জিয়ত্তো

এগার-জাতি সমন্বয়ে গঠিত ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা ২ জুলাই ১৯৮৫ তারিখে পাঠায় জিয়ত্তো নামে নভোযান। জিয়ত্তো মধ্যযুগের (১২৬৬-১৩৩৭) ইতালীর ফ্লোরেন্সবাসী এক জন বিখ্যাত শিল্পীর নাম। ইনি ১৩০৩ সালে 'অ্যাডোরেশন অব দি ম্যাজাই' নামে যীশুখ্রীস্টের জন্মের একটি চিত্র এঁকেছিলেন, তাতে বেথলেহেমের

তারা হিসেবে হ্যালির ধূমকেতুর ছবি রয়েছে। আজ বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলছেন যীশুখ্রীস্টের জন্মের সময় আসলে এই ধূমকেতু দেখা দেয় নি, তবে দেখা দিয়েছিল ১২ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। এই ছবি আঁকার দু'বছর আগে হ্যালির ধূমকেতু দেখা দেয়, সেজন্যই সম্ভবত যীশুর জন্মের দৃশ্যে শিল্পী রূপক হিসেবে ধূমকেতুকেই নতুন তারার উদয় হিসেবে দেখিয়েছেন।

জিয়ত্তো নভোযান প্রায় তিন মিটার উঁচু, ছোঁড়ার সময় তার ভর ছিল ৯৬০ কিলোগ্রাম। এই বেলুনাকার যানটি প্রতি চার সেকেন্ডে নিজের অক্ষের চারপাশে একবার ঘোরে। হ্যালির ধূমকেতুর মাপ-জোখ নেবার জন্য এতে দশ রকম পরীক্ষণের যন্ত্রপাতি বসানো হয়। এটি ১৩-১৪ মার্চ ১৯৮৬ মধ্যরাতে ধূমকেতুর কেন্দ্র থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার দূরে দিয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা আগে যেমন অনুমান করেছিলেন ঠিক তেমনিভাবে এ সময়ে বালির দানার মতো অসংখ্য কণা নভোযানের গায়ে আঘাত করতে থাকে। তখন ধূমকেতুর সাথে নভোযানের আপেক্ষিক বেগ ছিল সেকেন্ডে প্রায় সত্তর কিলোমিটার। বুলেটের চেয়ে প্রায় পঞ্চাশগুণ বেগে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় একশটি কণা নভোযানের গায়ে পড়তে থাকে। তাতে নভোযান যখন ধূমকেতুর কেন্দ্রের প্রায় সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছেছে তখন তার অ্যানটেনা বেঁকে যায় এবং পৃথিবীতে ছবি পৌঁছনো বন্ধ হয়। অবশ্য তার আগেই দু'হাজারের বেশি ছবি পাওয়া গিয়েছিল। তাছাড়া অন্যান্য সংবেদী যন্ত্রে নেয়া মাপজোখ সংক্রান্ত বিপুল পরিমাণ তথ্যও ঠিকই এসে পৌঁছেছিল।

বিজ্ঞানীরা প্রথমে অনুমান করেছিলেন ধূমকেতুর কেন্দ্র হবে উজ্জ্বল আর গোল—মোটামুটি পাঁচ থেকে দশ কিলোমিটার চওড়া। কিন্তু এসব ছবি থেকে বোঝা গেল অনুমানটা পুরোপুরি ঠিক নয়, কেন্দ্র অতি কালো আর চীনাবাদামের মতো লম্বাটে ধরনের—লম্বায় প্রায় ১৬ কিলোমিটার আর চওড়ায় সাত-আট কিলোমিটার। আর এই কেন্দ্রের গা অতি এবড়ো-খেবড়ো। কালো রঙ থেকে মনে হয় সেখানে কারবন রয়েছে। এমন কি কারবনঘটিত জৈব উপাদান থাকাও সম্ভব। কেন্দ্রের গায়ে কোন কোন জায়গা দিয়ে বিপুল বেগে বেরিয়ে আসছে গ্যাস, পানির বাষ্প আর ধুলো—প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৫০ টন ওজনের বস্তু।

শেষের সেদিন ভয়ংকর

বাংলাদেশে মানুষের গড়পড়তা আয়ু পঞ্চাশ বছরের মতো; ভারতে পঞ্চান্ন। কোন কোন উন্নত দেশে মানুষের আয়ু এর প্রায় দেড়গুণ। আসলে একজন মানুষের কখন জন্ম, কখন মৃত্যু তার হিসেব রাখা তেমন কঠিন নয়—তাই এসব গড় আয়ুর হিসেব সহজেই পাওয়া যায়। একটি গাছের গুঁড়ি কেটে তার ভেতরকার চক্র হিসেব করে সে গাছের বয়সও বের করা যায়। নানা জাতের গাছের আয়ু কত পঞ্চাশ তাও আমরা মোটামুটিভাবে বলতে পারি।

কিন্তু আমরা যে পৃথিবীর ওপর বাস করছি তার বয়স কত?—সে হিসেব জানা অত সহজ নয়। তার চেয়েও কঠিন পৃথিবী আর কত বছর টিকবে অর্থাৎ পৃথিবীর আয়ু কত তা বলতে পারা। এককালে লোকে ভাবত পৃথিবীর বয়স বড়জোড় দশ-বার হাজার বছর; ব্যাবিলন সভ্যতার সময়ে ধারণা করা হত পৃথিবীর বয়স হতে পারে বিশ লাখ বছর। আজ থেকে মাত্র শ'খানেক বছর আগে ইংরেজ ভূ-বিজ্ঞানী জোলি হিসেব করে বলেছিলেন পৃথিবীর বয়স হবে প্রায় ত্রিশ কোটি বছর। অথচ আজ বিজ্ঞানীদের সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে আমরা জানি পৃথিবীর বয়স সাড়ে চারশ' কোটি বছরের কম নয়।

এর চেয়েও জরুরী যে কথা এর মধ্যে জানা গেছে সে হল পৃথিবীর জন্ম কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পৃথিবীর জন্ম হয়েছে সূর্য এবং সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গে একই সময়ে—এক বিপুলে ঘূরপাক খাওয়া গ্যাসপুঞ্জের অংশ হিসেবে। এই গ্যাসপুঞ্জ ঘূরপাক খেতে খেতে এক পর্যায়ে তার কেন্দ্রবস্তু ভেতরমুখো আকর্ষণের টানে অতি ঘন আর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তাপ-পারমাণবিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে ঘন কেন্দ্রবস্তুটি তখন জ্বলন্ত সূর্যের রূপ নেয়। আর তার চারপাশে ঘূরতে থাকা গ্যাসীয় বস্তু ঘূর্ণির আকারে ঘনীভূত হয়ে

নানা গ্রহ-উপগ্রহের জন্ম দেয়। তারই মধ্যে একটি হল আমাদের পৃথিবী।

ছায়াপথ আর মহাবিশ্ব

কিন্তু তার পরও প্রশ্ন থেকে যায়। অন্ধকার রাতে আকাশে উত্তর-দক্ষিণে ছড়ানো 'ছায়াপথ' নামে যে নক্ষত্রপুঞ্জ দেখা যায় আমাদের সৌরজগৎ রয়েছে তার ভেতরে। এই ছায়াপথের মধ্যে সূর্যের মতো নক্ষত্র আছে নাকি প্রায় দশ হাজার কোটি, অর্থাৎ ছায়াপথ হল এক বিশাল নক্ষত্রবিশ্ব। এই ছায়াপথের মতো আরো হাজার কোটি বিশ্ব মিলিয়ে হল বিপুল মহাবিশ্ব। এসব বিশ্ব আর মহাবিশ্বের জন্ম কবে কিভাবে হয়েছিল? আমাদের বিশ্ব আর এমনি অসংখ্য নক্ষত্র-জগৎ নিয়ে যে বিপুল মহাবিশ্ব এসব কি চিরন্তন, না এদের আয়ুও সীমাবদ্ধ? কতদিন টিকবে আমাদের পৃথিবী আর সৌরজগৎ; আমাদের বিশ্ব আর মহাবিশ্ব? কবে বেজে উঠবে ভয়ংকর সেই শেষ দিনের প্রলয় বাঁশি? সে দিনটি দেখার জন্য মানুষ কি টিকে থাকবে?

—এমনি সব প্রশ্ন মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে চিরকাল; ভাবাচ্ছে আজও। বিশ্বজগতের জন্ম-মৃত্যু-বিকাশ এসব নিয়ে চিন্তা থেকে বিশ্বতত্ত্ব বা 'কসমোলজি' নামে বিজ্ঞানের নতুন এক শাখারই জন্ম হয়েছে।

প্রাচীনকালে এ ধরনের বিষয়ে মানুষের চিন্তা ছিল প্রধানত কল্পনা-নির্ভর। তারপর সপ্তদশ শতকে গ্যালিলিও-কেপলার-নিউটনের সাথে এল দূরবীনের যুগ। দূরবীনের সাহায্যে মহাকাশের অনেক দূরের বস্তুর আলো দেখা যেতে লাগল। আজ পর্যবেক্ষণের আর পরীক্ষণের আশ্চর্য সব নতুন নতুন যন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে। বিশাল আলোক-দূরবীনের সাথে যোগ হয়েছে বেতার দূরবীন, অবলোহিত তরঙ্গ দূরবীন, অতিবেগুনি রশ্মি দূরবীন, রঞ্জনরশ্মি দূরবীন প্রভৃতি দূর মহাবিশ্বে দেখবার অতিসূক্ষ্ম নানা যন্ত্র; বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ আর বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে কমপিউটার-চালিত ইলেক-ট্রনিক ব্যবস্থা। এসবের ফলে বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের আজ বিপুল বিকাশ ঘটতে আরম্ভ করেছে।

মহাবিশ্বের সৃষ্টি কিভাবে হল সে সম্পর্কে আজকাল বিজ্ঞানীদের মধ্যে মোটামুটি একটা মতের মিল দেখা দিয়েছে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি তাঁরা লক্ষ্য করলেন, পৃথিবীর ওপর মহাকাশের সবদিক থেকে সর্বক্ষণ সমান ধারায় এক ক্ষীণ বেতার তরঙ্গ ভেসে আসছে। এই নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গপ্রবাহের নাম দেয়া হল 'পটভূমি বিকিরণ'। নানা জটিল গাণিতিক হিসেব থেকে বিজ্ঞানীরা বললেন আজ থেকে মোটা-মুটি দেড় হাজার কোটি বছর আগে অকল্পনীয় রকম ঘন আর শক্তিমান এক আদিকণিকা বিপুল মহাবিস্ফোরণে উৎসারিত হয়ে তার ছিন্নভিন্ন খণ্ড দিগ্বিদিকে ছুটতে আরম্ভ করেছিল। এই প্রসারিত বস্তুপুঞ্জ থেকেই ক্রমে ক্রমে জন্ম হয়েছে মহাবিশ্বের সব তারকালোকের। দেখা দিয়েছে আমাদের তারকালোক বা গ্যালাক্সি, আর তাতে নানা ভাঙ্গা-গড়ার পালা পেরিয়ে অবশেষে জন্ম নিয়েছে সৌরজগৎ আর পৃথিবী। সেই আদি মহাবিস্ফোরণে যে শক্তি বিচ্ছুরিত হয়েছিল তারই অবশিষ্ট হল আজকের পটভূমি-বিকিরণ। এই বিকিরণ আবিষ্কারের জন্য আরনো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন নামে দু'জন মার্কিন বিজ্ঞানী ১৯৭৮ সালে নোবেল পুরস্কার পেলেন।

বিজ্ঞানীরা তারাদের জীবনকাল নিয়ে গত কয়েক দশক ধরে নানা গবেষণা করেছেন। এসব গবেষণা থেকে জানা গেছে তাদেরও জন্ম, শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য, জরা ও মৃত্যু আছে। এমনকি আমাদের চোখের সামনেই গ্যালাক্সি বা ছায়াপথের মধ্যে পুরনো তারাদের মৃত্যু ঘটছে, উপরন্তু উত্তপ্ত নতুন তারার জন্ম হচ্ছে। ছায়াপথের বিপুল সংখ্যক তারার গুচ্ছের মধ্যে সূর্যও একটি তারা। এমনি মাঝারি আকারের তারাদের যে ধরনের জীবনচক্র হয়ে থাকে সে হিসেবে সূর্যের এখন যৌবনকাল বলা যেতে পারে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আজ থেকে প্রায় পাঁচশ কোটি বছর আগে এক বিপুল গ্যাসপুঞ্জ জোট বেঁধে ঘুরপাক খেতে শুরু করেছিল। সেই শীতল গ্যাসপুঞ্জের কেন্দ্রে আভ্যন্তরীণ আকর্ষণ আর ঘনিষ্ট-তার তাপমাত্রা যখন এক কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছয় তখন শুরু হয় তাপ-পারমাণবিক বিক্রিয়া—অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ার হাইড্রোজেন বোমার মতো সৃষ্টি হয় বিপুল পরিমাণ তেজ। হাইড্রোজেন পরমাণু জোড়া জোড়া মিলিত হয়ে সৃষ্টি করতে থাকে হিলিয়াম গ্যাস। এই উত্তপ্ত কেন্দ্রপুঞ্জই হয়ে দাঁড়াল আমাদের সূর্য। অন্যান্য তারাদের মতো সূর্যকে তার জীবনের মধ্যগগন পেরিয়ে একদিন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

সূর্যের মৃত্যু

সূর্যের আয়ু যেদিন নিঃশেষ হবে সেদিন সেইসাথে, বলা বাহুল্য, পৃথিবীরও জীবনদীপ যাবে নিভে। কিন্তু কখন আসবে সেই ভয়ংকর মৃত্যু? কতদিন তার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকতে হবে আমাদের?

দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করে বলার উপায় নেই। তবে তার একটা মোটামুটি হিসেব বিজ্ঞানীরা আমাদের দিচ্ছেন। সূর্যের ভেতরকার তাপ-পারমাণবিক বিক্রিয়ার হাইড্রোজেন জ্বলতে জ্বলতে একদিন তার পুঁজি নিঃশেষ হয়ে আসবে—অর্থাৎ প্রায় সব হাইড্রোজেন পরিণত হবে হিলিয়ামে। তখন সূর্যের কেন্দ্র যাবে চুপসে, আর সেই চুপসে যাওয়া পুষিয়ে নেবার জন্য বাইরের খোলসটা উঠবে শতগুণে ফেঁপে। বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী এমন অবস্থা ঘটবে আজ থেকে প্রায় পাঁচশ কোটি বছর পর। সূর্যের ভেতরকার তাপ এমন ফেঁপে ওঠা আয়তনে ছড়িয়ে পড়ায় তার গায়ের তাপমাত্রা প্রায় ছ'হাজার ডিগ্রী থেকে নেমে দাঁড়াবে মাত্র তিন হাজার ডিগ্রীতে। তার সাদাটে হলদে রঙ হয়ে দাঁড়াবে লালচে। এই 'লাল দানব' সূর্যের গা ফুলে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসবে; আর পৃথিবীর ওপর লাগবে তার প্রচন্ড গরম হলকা। পৃথিবীর উপরকার গড় তাপমাত্রা আজ মাত্র ১৫ ডিগ্রী সেঃ এর কাছাকাছি। ফেঁপে ওঠা অন্তিম সূর্যের ঝাপটা লেগে এই তাপমাত্রা বেড়ে উঠতে পারে ৪০০ ডিগ্রীতে। বলাবাহুল্য সে উত্তাপে পৃথিবীর ওপরকার প্রাণের সব চিহ্ন জ্বলে ছাই হয়ে যাবে।

কিন্তু শেষের পরেও শেষ থাকে। সূর্যের ওপর দিকে ফেঁপে ওঠা হালকা খোলসটা এক সময় হারিয়ে যাবে মহাশূন্যে। তার ভেতরকার কেন্দ্রবস্তু চুপসে গিয়ে পরিণত হবে একটা অতি ছোট 'শ্বেত-বামন' তারায়। তখন তার ভর থাকবে মোটামুটি আগের মতোই, অথচ আকার হয়ে দাঁড়াবে প্রায় পৃথিবীর সমান। এই অতি ঘন বস্তুতে আর তাপ-পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটাতে পারবে না, তাই ক্রমে ক্রমে জমানো পুঁজি হারিয়ে সেটা হয়ে দাঁড়াবে একটা 'কালোবামন'।

সেদিন সত্যি সত্যি সূর্য নিভে যাবে, আর সেই সাথে সৌরজগতের মৃত্যু ঘটবে। দীপ্তিহীন তার খন্ডগুলো ঘুরতে থাকবে মহাকাশে। একদিন কাছাকাছি কোন বড় তারার প্রচন্ড অন্তিম বিস্ফোরণে হয়তো একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে ধুলোয় মিশে যাবে এই মরা সৌরজগতের খন্ডগুলো।

তারপর আবার কোনদিন এই ধ্বংসস্তূপ থেকে হয়তো জন্ম নেবে আর এক নতুন নক্ষত্র; সৃষ্টি হবে আর কোন নতুন পৃথিবীর।

আবদ্ধ আর মুক্ত মহাবিশ্ব

এতো গেল সৌরজগতের কথা। কিন্তু এই বিশ্ব আর মহাবিশ্বের কি হবে? তারাও কি এমনি একদিন নিভে যাবে, অথবা প্রচন্ড বিস্ফোরণে জ্বলে উঠবে? মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা আজ যতটা একমত, তার শেষ সম্বন্ধে ততটা একমত নন।

এযাবৎ মানুষ যতটা জেনেছে তাতে বোঝা যায় সেই আদি মহাবিস্ফোরণের সময় থেকে মহাবিশ্বে অসংখ্য নক্ষত্রলোক কেবলই পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে চলেছে। এই ব্যাপারটা প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন মার্কিন বিজ্ঞানী এডউইন হাব্‌ল্‌ ১৯২৯ সালে। মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরে দেড় মিটার (৬০ ইঞ্চি) ব্যাসের দূরবীনের ভেতর দিয়ে দূরের নক্ষত্রলোকের আলো দেখলেন তিনি যেন সরে লালের দিকে ঘেঁষা। এমনটি হওয়া সম্ভব নক্ষত্রগুলি প্রচন্ড বেগে সরে যেতে থাকলে।

আসলে হাব্‌ল্‌ নক্ষত্রদের আলোর যে লাল অপসারণ দেখেছিলেন তা আর এর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে পেনজিয়াস আর উইলসন যে পটভূমি-বিকিরণ পেয়েছিলেন এ দুইই এক সূত্রে গাঁথা। দুইই সুদূর অতীতে এক মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ইঙ্গিত দেয়।

তারপর আরো বড় দূরবীন তৈরি হল। ১৯৪৮ সালে মাউন্ট পালোমার মানমন্দিরে বসল পাঁচ মিটার (২০০ ইঞ্চি) ব্যাসের দূরবীন। তাতেও প্রমাণ মিলল দূরের নক্ষত্রদের এমনি দূরে সরে যাবার। আজকে বিজ্ঞানীদের মধ্যে একদল বলছেন মহাবিশ্বে নক্ষত্রলোকের এমনি ছড়িয়ে পড়া চলতে থাকবে অনন্তকাল ধরে। আর অনন্তকাল ধরে এমনি বাইরের দিকে ছুটতে থাকলে একদিন না একদিন সব নক্ষত্রই তাদের তাপ হারিয়ে সূর্যের মতো নিভে যাবে।

আবার অপর দল বিজ্ঞানী বলছেন, না তা হয় না। সেই আদি প্রচন্ড মহাবিস্ফোরণের ঝাপটার বেগ এক সময় ক্রমে ক্রমে কমে আসবে। মহাকর্ষীয় আকর্ষণের টানে তখন মহাবিশ্বের সব বস্তু আবার রওনা দেবে কেন্দ্রের পানে অর্থাৎ মহাবিশ্বের আয়তন ছোট হয়ে আসবে আর

সেই সাথে তারকালোকের পরস্পরের দূরত্ব কমতে থাকবে। বহু হাজার কোটি বছর পেরিয়ে এই সংকুচিত মহাবিশ্ব হয়তো আবার রূপ নেবে আদিতে মহাবিস্ফোরণের সময় যেমন ছিল তেমনি এক মহাকণিকার।

কিন্তু সেই মহাকণিকাই কি শেষ?—খুব সম্ভব নয়। হয়তো সেই মহাকণিকাতে ঘটবে আবার এক মহাবিস্ফোরণ। বিপুল বস্তুকণা অসংখ্য নতুন বিশ্বের বীজ বুকে নিয়ে ছুটতে শুরু করবে চতুর্দিকে —শুরু হবে আর এক মহাবিশ্ব।

এই দুটো সম্ভাবনার কোন্‌টা যে সত্যি সত্যি ঘটবে তা নির্ভর করে বিশ্বে মোট বস্তুর পরিমাণ কত তার ওপর। যতটা বস্তু থাকলে তার আকর্ষণের টানে মহাবিশ্বের বিস্তার থেমে গিয়ে শেষটায় সংকোচন শুরু হতে পারে, ততটা বস্তু বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় আজো ধরা পড়ে নি। এমনকি তফাৎটা যে কতখানি তা নিয়েও মতের বেশ গরমিল আছে। কেউ সূক্ষ্ম পরীক্ষা করে জটিল অঙ্কজোখ কষে বলছেন বস্তু পাওয়া যাচ্ছে নির্দিষ্ট মাত্রার মাত্র ছ'শতাংশ; আবার কেউ অন্য পরীক্ষা থেকে বলছেন আসলে বস্তু আছে ষাট শতাংশ! তবে বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই মনে করছেন পরীক্ষার যন্ত্রপাতি আরো উন্নত হলে হয়তো ভবিষ্যতে এমন অজ্ঞাত বস্তু ধরা পড়তে পারে যাতে দেখা যাবে মহাবিশ্বের ভেতরমুখো যাত্রা সম্ভব।

মহাবিশ্ব কি অনন্তকাল ধরে প্রসারিত হয়ে শীতল মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে, না একদিন সংকুচিত হয়ে ঘটাবে আরেক মহাবিস্ফোরণ এবং সম্ভবত জন্ম দেবে আরেক মহাবিশ্বের?—এ প্রশ্নের জবাব তাই এখনই স্পষ্ট করে দেয়া যাবে না। এই রহস্যের মীমাংসার জন্য আমাদের আরো অপেক্ষা করতে হবে।

আগস্ট, ১৯৮৬